কৃশানু

একটি মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

চুয়ান্ন বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৪২৮

কিশোর সংখ্যা



ঠাকুর্দার নাম ছিল উপেন্দ্রকিশোর
কিশোর সাহিত্যে তিনি এনেছেন জোর।
তাঁর পুত্র সুকুমার চির সুকুমার
কিশোর সাহিত্যে তিনি অতি চমৎকার।
তস্য পুত্র সত্যজিৎ মহা গুণবান
কিশোর সাহিত্যে তাঁর ধন্য অবদান।



একটি রোমাঞ্চকর কিশোর উপন্যাস

পরিবেশক

পত্রভারতী

৩/১, কলেজ রো, কলকাতা - ৭০০০০৯

কৃশানু

একটি মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

চুয়ান্ন বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ১৪২৮

সত্যজিৎ রায়ের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে
কিশোর সংখ্যা

৩০/১এ, কলেজ রো, কোলকাতা-৭০০ ০০৯
krishanupatrika@gmail.com

কৃশানু

চুয়ান্ন বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ১৪২৮

সম্পাদক : মনন দাস

সূচীপত্র

ইলাস্ট্রেশান	**কম্পিউটার গ্রাফিক্স**	**প্রচার ও জনসংযোগ**
রেবা মুখার্জি ও সংগ্রহ	প্রদীপ মণ্ডল	ডাঃ সমীর কুমার বেতাল

প্রচ্ছদ ঃ মনন দাস

সম্পাদকীয়—

বাংলা মায়ের মানিক ছেলে সত্যজিৎ রায়

কিশোর বন্ধুরা, কৃশানুর কিশোর সংখ্যায় তোমাদের স্বাগত জানাই। সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষে তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম।

"আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে
শাখে শাখে পাখি ডাকে
কত শোভা চারিপাশে
আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে!"

সহজ এমন ছোট ছোট শব্দ দিয়ে গাঁথা গান, এমন সহজ মধুর সুরে মাখা গানের সৃষ্টিকর্তা সত্যজিৎ রায়, যে গান কখনো পুরোনো হয় না। ইউনেস্কোর বিচারে পৃথিবীর সকল ভাষার মধ্যে মিষ্ট ভাষা বাংলা ভাষা। সেই ভাষার কৃতি সন্তান সত্যজিৎ কত সহজ কথায় মায়ের ভাষার গুণগান করেছেন কত সহজ সুন্দর সুরে সেই গানকে মধুর করেছেন।

"মহারাজা তোমারে সেলাম
মোরা বাংলা দেশের থেকে এলাম
মোরা সাদা সিধা মাটির মানুষ দেশে দেশে যাই,
মোদের নিজের ভাষা ভিন্ন আর ভাষা জানা নাই।

মোরা সেই ভাষাতেই করি গান।
এ যে সুরেরই ভাষা, ছন্দেরই ভাষা
তালেরই ভাষা, আনন্দেরই ভাষা
ভাষা এমন কথা বলে বোঝেরে সকলে
উঁচা নিচা ছোট বড় সমান
মোরা সেই ভাষাতেই করি গান।"

মাতৃভাষার প্রতি কত গভীর ভালভাসা থেকে এমন সুন্দর বন্দনা জন্ম নেয়! আর সেই দরদেই তিনি কিশোরদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এমন চলচ্চিত্র। সিনেমা তো শুধু ছবি নয় ভালো সিনেমা সে তো শিক্ষারও বাহন। তিনি তাঁর গানের মাধ্যমে শিখিয়েছেন আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে ভালবাসতে, ভাষাকে উঁচু আসনে বসাতে। আমরা যেন তা মনে রাখি এবং সার্থক করে তুলতে পারি।

শুধুমাত্র মাতৃভাষা বাংলাতেই তিনি সারাজীবন উৎকৃষ্ট সব চলচ্চিত্র উপহার দিয়েছেন, ছড়িয়ে দিয়েছেন সারা পৃথিবীতে, জয় করেছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মান, তাঁর মানিক নাম সার্থক।

এরপর সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান অসাধারণ। কিশোর সাহিত্যে তাঁর ঠাকুর্দা উপেন্দ্রকিশোর, বাবা সুকুমার রায়ের সৃষ্টির উত্তরসুরী তিনি।

দশ বছর বয়সে মা সুপ্রভা রায় কিশোর সত্যজিৎকে নিয়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করাতে। সত্যজিৎ তার অটোগ্রাফের খাতা রবীন্দ্রনাথকে দিলে তিনি সই না করে একদিন খাতাটি রেখে দিয়েছিলেন ও পরদিন ফেরৎ দিয়েছিলেন সেই বিখ্যাত কবিতা লিখে ঃ

"বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপর একটি শিশির বিন্দু।"

হয়তো রবীন্দ্রনাথ সেদিন সেই কিশোরের মধ্যে বিন্দুতে সিন্ধুর আভাস পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি। রবীন্দ্রনাথের বাঁশি সত্যজিতের মনেও সুর ছড়িয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য সত্যজিৎ ষোল বছর বয়সে শান্তিনিকেতনে আসেন, ছাত্র হয়ে যোগ দেন এবং কবিগুরুর মৃত্যুপর্যন্ত থাকেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে নিঃশব্দে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর প্রভাব।

কিশোরদের জন্য রচিত তাঁর গল্প বাংলা সাহিত্যের অনন্য সম্পদ। কিশোরদের জন্য সৃষ্ট তাঁর চলচ্চিত্র বাংলা সিনেমার জগতে অসাধারণ সংযোজন।

কিশোর বন্ধুরা, মনে রাখতে হবে পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা বাংলা ভাষা। এর জন্য আমরা গর্বিত। অনেক জ্ঞানী গুণী মহাজন বাংলায় জন্মগ্রহণ করেছেন। সাহিত্যে সঙ্গীতে জ্ঞানে বিজ্ঞানে সংস্কৃতিতে তাঁদের অবদান মানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে। তোমরাও গর্বের সঙ্গে সেই সব মানুষের অনুগামী হও এবং বাংলা মায়ের মুখ উজ্জ্বল করো।

মনন দাস
সম্পাদক



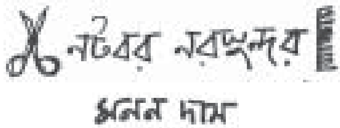
প্রকাশক

পাঠক

৩৬এ, কলেজ রো, কলকাতা - ৭০০০০৯

দাম ঃ ১৫০ টাকা মাত্র

ছড়ায় গল্প





নাম তার নটবর
নামে কিছু গড়বড়
ইংরাজি নাম তার
হয়ে গেছে
NATABAR
পেশা তার BARBER
মানে - নরসুন্দর।
আমাদের গ্রামে তার
একছত্র অধিকার
আর কেউ ছিলনাকো
চুলদাড়ি কাটবার
সে যে এক ইতিহাস
ক্রমশঃ করি প্রকাশ
শোনো বলি দিয়া মন
নটবর আলাপন।

আমার বয়স এখন হলো আশি
পুরোনো গল্প বলতে ভালোবাসি

ছোটবেলায় আমি যখন অ আ ক খ পড়ি
নটবরদা কাটতো এসে বাবার চুল আর দাড়ি।
কুচুং কুচুং কচাং কচাং কাঁচির নাড়ানাড়ি
দেখতে দেখতে হেসেই আমি দিতাম গড়াগড়ি।
‘একি কাণ্ড সৃষ্টিছাড়া!’ বলত বাবা - ‘ওরে দাঁড়া!’
মা বলতো - ‘করছিস তুই বড্ড বাড়াবাড়ি!’
কাচুমাচু নটবরদা, সঙ্কুচিত যেমন কাদা,
বলত - ‘এত হাসি কিসের!’ মুখটা করে হাঁড়ি।

কিন্তু যখন আমার মাথার ওপর চলত কাঁচি,
তখন বন্ধ হয়ে যেত মজার নাচানাচি।



কেঁদে কেটে হতাম সারা, নামতো চোখে জলের ধারা,
মনে হতো - হায় ভগবান কেমন করে বাঁচি!

কয়েক বছর কেটে গেল মজার হাসি বন্ধ হলো
বন্ধ হলো চোখে জলের ধারা,
চুলে নানান ধাঁচের তেড়ি বাগিয়ে নিতে হয় যে দেরী
চুলের বাহার ভাবতে যে হই সারা।
বাবা করেন অর্ডার জারি ছোট চুলের হুকুমদারি
বাধ্য ছেলে থাকি চমৎকার,
কিন্তু বাবা যেই উঠে যান আমি হয়ে যাই পালোয়ান
চোখ পাকিয়ে বলি - 'খবরদার!
অত কেন খাটোখোটো অল্পস্বল্প কাটোছাঁটো
এতো বাড়াবাড়ির কি দরকার'?
নটবরদা নাছোড়বান্দা বেশী বেশী ছাঁটার ধান্ধা
চুলের সমাহার করে ছারখার।

বাবার যুগ কেটে গেল গ্রামে শহর হাওয়া এলো
পাল্টে গেল কতই রাতারাতি
কাঁচা রাস্তা পাকা হলো ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল
হাল ফ্যাসানের ইলেকট্রিক বাতি।
নবীন সবাই শহরে যায় নানান চুলের বাহার খেলায়
শহরে সব সেলুন চিকন চাকন,
দেখে দেখে নটবরদায় ফ্যালর ফ্যালর চোখে তাকায়
'হায় ভগবান করি কিবা এখন!'
গ্রামের মোড়ল একটু কেসে একটুখানি মিচকি হেসে
বলেন 'শোনো বাছা নটরলাল,
এবার একটা সেলুন খোলো দিনকাল যেমনটি হলো
পাকা চুলে নতুন ফেরাই হাল।'



ভাবে বসে নটবর
মাথা করে খরখর
সেলুন খুলতে হবে
নাহলে কাজটা যাবে।
চুলকাটা ছেড়ে দিয়ে
হয়তো বা মাঠে গিয়ে

কাটতে হবে যে মাটি
সে যে বড় খাটাখাটি।
সাত পুরুষের নাম
যাবে যে নরকধাম!
চিন্তা করিয়া শেষ
নটবর বলে - 'বেশ,
সেলুন হবেই হবে
দুখ আর নাহি রবে!'



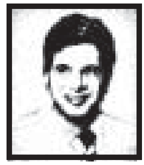
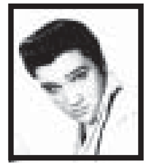
শুনে গ্রামে পড়ে যায় সরগোল
এবার গ্রামের পাল্টাবে ভোল
নটবর সেলুনের বাহারে
আধুনিক হবে গ্রাম আহারে!



দেখেশুনে আমার মনে উঠল নানান ঢেউ,
চুলের স্বাধীনতা হরণ করবে না আর কেউ!
সারাদিনে কত রকম চুলের যত্নআত্তি,
তেল চাই, আর ক্রীম চাই, চাইযে শ্যাম্পু পাত্তি।
চিরুনি নিয়ে চুলের রাজ্যে মরি খেটে খেটে,
আয়নাতে মুখ দেখে দেখে মনের সাধ না মেটে।
সামনে পিছে চুল বাড়িয়ে রাখবো রকমারি,
দেশ বিদেশের নানা ছাঁটের করবো বাহার জারি!
কিন্তু কি আর বলবো বলো দুখের খবর ভাই,
নটবরদা নতুন ছাঁটের কিছুই শেখে নাই।
সেই কথাটি চুপি চুপি বলল এসে আমায় –
'কি করে চুল কাটি বলো নিত্য নব কায়দায়?
ছোট থেকে দেখছি খুবই চালাক চতুর তুমি,
একটা কিছু উপায় করো উদ্ধার হই আমি।'

দুই দিন দুমিনিট
মনটাকে করে ফিট্
মাথা মুড়ো চুলকিয়ে
না খেয়ে না ঘুমিয়ে
করে ফেলি সমাধান
নটদাদা পায় প্রাণ!

ছবি যত নায়কের
দেশ আর বিদেশের
ঘুরে ঘুরে কলকাতা
কিনে আনো পাতা পাতা,
ফ্রেম দিয়ে বাঁধিয়ে
দাও সব সাজিয়ে।
যার যাহা প্রাণ চায়
কেটে দাও কায়দায়
দেখে দেখে ছবি সব,
লেগে যাবে কলরব।



নামটা কিন্তু বেশ জব্বর দিতে হবে
দেখে শুনে ইন্টারন্যাশানাল মনে হবে!
সেটাও ভেবেছি আমি কোরো নাকো চিন্তা
শুনে নটবরদা নাচে তা তা ধিন্ তা!



নামটি ভারি চমৎকার
নীচে লিখে দিলাম তার
বানান করে পড়ে ফেলুন
পৃথিবী বিখ্যাত সেলুন –

NATABAR BARBER

The International Hair Dresser

ছড়ার মালা - ১

রোদ্দুর ■ হাসানআল আব্দুল্লাহ

রোদ্দুর তুই সাত সকালে
আমার সাথে যাবি,
আমার হাতে আছে এখন
তেপান্তরের চাবি।

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হালকা বাতাস
পেলব কোমল লম্বাটে ঘাস
নদীর স্রোতে ঢেউয়ের দোলায়
অনেক মজা পাবি।।

আকাশ খোলা দিনের খেয়া
বুক ভরা শ্বাস যাবে নেয়া।

যাদুর মতন সাজিয়ে রাখা
গাছ গাছালির ছবি আঁকা
আমার গাঁয়ের সবাইকে তুই
শুভেচ্ছা জানাবি।।

হাসানআল আব্দুল্লাহ

জন্ম ঃ ১ বৈশাখ, ১৩৭৪

স্থান ঃ গোপালগঞ্জ, বাংলাদেশ

পড়াশোনা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক।

প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ঃ ৪৮

পুরস্কার ঃ হোমার ইয়োরোপিয়ান মেডেল।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ নক্ষত্র ও মানুষের প্রচ্ছদ, স্বতন্ত্র সনেট, আঁধারের সমান বয়স, কবিতার ছন্দ, ঐতিহ্য ও ব্যক্তিপ্রতিভা, কবিতার জন্মদাগ, শয়তানের পাঁচ পা, ডহর ও আগুার দ্য থিন লেয়ার্স অব লাইট।

পেশা ঃ শিক্ষকতা।

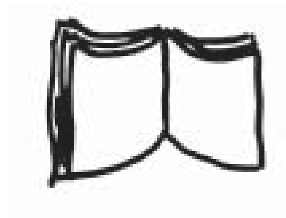
বাংলাদেশ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে কবির স্মৃতিচারণ

বাবা চলে যাবার ৪৮ বছর পর যখন মা বললেন, পাক সেনারা যখন বাবাকে ধরে নিয়ে পিটায়, প্রথমেই তাঁর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিটা ভেঙ্গে যায়। বাবা সহ বেশ কিছু নারী পুরুষকে ওরা একযোগে সেদিন নির্বিচারে প্রহারের পর মধুমতি নদীর পাড়ে সারিবদ্ধ দাঁড় করিয়ে ব্রাস ফায়ারে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। সেই ফায়ারিং স্কোয়াড থেকে দু'একজন নদীতে রক্তাক্ত ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং বেঁচেও যান। আমার বাবাও সেইভাবে বেঁচে গিয়ে কিছুদিনের ভেতরেই স্বাধীনতার জন্য তিরিশ লক্ষের একজন হয়ে যান। মায়ের মুখে বাবার আঙুল ভাঙ্গার কথা যেদিন শুনি তার ছমাস আগে থেকে আমার ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলে কোনো কাজের ফাঁকে চোট লেগে একটা চিনচিনে ব্যথা হচ্ছিলো। কিন্তু ব্যথা যে কখনো কখনো মধুর হয়ে ওঠে সেই প্রথম আমি বুঝতে পারি। মনে হতে থাকে বাড়ুক না, ব্যথাটা আরেকটু বাড়ুক।

আমার বাবার চেহারা আমার মনে নেই, তাঁর কোনো ছবিও নেই যে দেখে প্রাণ ভরে বাবা বলে ডাকবো আর চোখির পানি ঝরাবো। আজ স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে তাই চোখের জল ফেলি আর বাংলাদেশের মানচিত্র দেখি। দেখি পুরো মানচিত্র জুড়ে বাবার মুখ। দেখি পুরো মানচিত্র জুড়ে তিরিশ লক্ষ শহিদের মুখ। শুভ জন্মদিন, প্রিয় বাংলাদেশ।

খেলাধূলা ■ বিভু মুখোপাধ্যায়

খোলামেলা – খেলাধূলা
চল সব বইমেলা।
হাসি-কান্না, হীরা পান্না
মিথ্যা কথা বলতে মানা।
খাওয়া-দাওয়া, চাওয়া-পাওয়া
সব কাজ সেরে নেওয়া।।





কিশোর বেলা ■ মিলি দাস

সেই যে আমার স্মৃতিঘেরা অলস দুপুরবেলা,
ইচ্ছেমত যেদিকে চাই লুকোচুরির খেলা।

শ্যামল গাঁয়ের বর্ণমালা আমার ঘরের কোণে,
চিরকালের চুপ কথারা গভীর সংগোপনে।

বয়সটা যে বাঁধ মানে না কোন শাসন বারণ
মন ভুলিয়ে মায়ের কাছে নানারকম কারণ।

পথের ধারে উদাস কিশোর কারো অপেক্ষায়,
সাতরঙা রং গায়ে মেখে ওই দূরে কে যায়?

নিঝুম রাতে বুকের মাঝে উথাল পাথাল ঢেউ,
মনখারাপের বায়নাগুলো বুঝবে না তো কেউ।

শব্দ দিয়ে আলপনা দিই মনের অন্তরালে
জড়িয়ে থাকে নতুন মায়া আবেগ মাখা জালে।

চুপ কথাদের বুলি ফোটে মনের বারান্দায়
অন্ধকারেও সুখ খুঁজে পাই মুক্ত জানালায়।

অনিয়মের ছকে বাঁধা স্বাধীন ঘেরা জীবন
দুর্বার বেগে ছুটছে কিশোর অন্তরালে দহন।

শীতল ছায়ায় মাদুর পেতে যত্নে লিখি চিঠি,
সুখ পেতে দিই বিছানাতে ছল ছল দুই চিঠি।

জয় বাবা ফেলুনাথ ■ স্বরূপ সিংহ রায়

শোনো শোনো বলি শোনে কোরো নাকো হট্টগোল
ভেবেছ কি শুধুই কেন গ্যাংটকেতে গণ্ডগোল?

আবার বলি শোনো সবে, জেনে নিও তাড়াতাড়ি
শুধুই কেন ঘটতে থাকে কৈলাসেতে কেলেঙ্কারি।

বোম্বাইতে থাকে কেন হাজারো লাখো বোম্বেটে
বাদশাহী আংটির খোঁজে কেমন চোর এসে জোটে?

খুনখারাবীর গন্ধ ভাসে হাওয়ায় হাওয়ায় বোসপুকুরে
গোরস্থানে সাবধান, যেও না কেউ রাতদুপুরে।

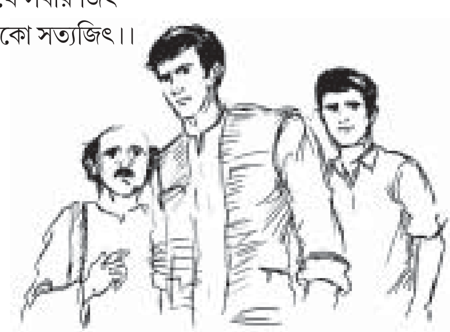
কাণ্ড যত কাঠমাণ্ডুর, লিখলো চিঠি নেপোলিয়ন
রবার্টসনের রুবি দেখে ভরলো সবার দুটি-নয়ন।

হারালো চাবি সমাদ্দারের, রহস্য খুব বাক্স ভরা
সোনার কেল্লা ঘুরে এসো পাবে অনেক রত্ন ঘড়া।

এসো এসো দেখবে এসো কাণ্ড এবার কেদারনাথে
কম যায় না ঘুরঘুটিয়াও বুদ্ধিটুকু রেখো সাথে।

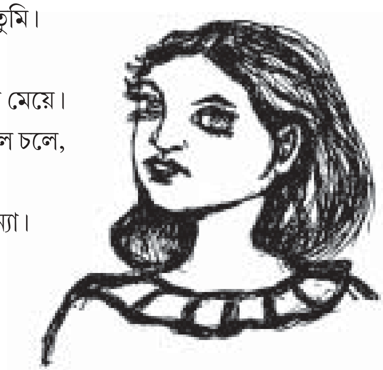
ছিন্নমস্তার অভিশাপ, হত্যাপুরী ভীষণ আঁধার
জয় বাবা ফেলুনাথ, তুমিই উপায় যত ধাঁধার।

তুমিই উপায় ফেলুনাথ, তোমার সাথে সবার জিৎ
সব বাঙালীর প্রণাম নিয়ে ভালো থেকো সত্যজিৎ।।



আমি মেয়ে ■ মিতা ঘোষ

আমি যখন জন্মেছিলাম,
শাঁখ বাজেনি, পড়েনি উলুধ্বনি,
কাঁদতে কাঁদতে মাকে তখন অনেক খুঁজেছি আমি -
আমার কান্না শুনলেনা মা, কাঁদতে লাগলে তুমি।
কান্না ভেজা সারাটা মুখ দুঃখে গেল ছেয়ে,
কেন মা গো এমন করলে তুমিও তো একটা মেয়ে।
তোমার মনের স্বপ্নগুলো ভাসিয়ে নিয়ে গেল চলে,
চোখের জলের বন্যা -
কারণ আমি ছেলে নই তোমার আদরের কন্যা।
ভেবোনা মা, আমিই পারব মুখে তোমার
ফিরিয়ে আনতে জয়ের হাসি,
আমি যে কেবল তোমারই মেয়ে, মাগো
তোমায় বড্ড ভালোবাসি।
সহ্যশীলা মা যে তুমি একটু সহ্য করো,
দেখবে তুমি ভবিষ্যতে আমি হবই অনেক বড়।
খুশিতে তোমায় ভরিয়ে দেব মান দেব আঁচল ভরে,
একটু এখন আদর কর মা, আমায় বুকে ধরে।
যেদিন দেখবে খুশির জোয়ার,
তোমার দুয়ারে আসবে ধেয়ে -
সেদিন তুমি বলবে জানি,
আয় রে বুকে আমার সোনা মেয়ে।



স্বপ্ন চাই ■ কল্যানী মণ্ডল

ফেরিওয়ালা হেঁকে যায়,
রোজ রোজ রাতে,
স্বপ্ন চাই গো স্বপ্ন চাই,
দেবো ঘুমের সাথে।
ছোট শিশু বড় খোকা,
সবার জন্য আছে,
কত রকমের স্বপ্ন,
চাই কি আমার কাছে?
একটা ছোট্ট শিশু,
বললো তাকে ডেকে,
একটা পরীর স্বপ্ন দাও,
আমার চোখে এঁকে।
নীল আকাশে ভেসে ভেসে,
যাবো দূরের দেশে,
ভোর হলে মায়ের ডাকে,
নামবো তখন এসে।

শব্দ ■ ঘনশ্যাম কল্পতরু

শব্দ নিয়ে ভাঙিচুরি
শব্দে কোলাহল
শব্দ রঙের খেলায় মাতে
গ্রাম শহর জঙ্গল।

তোমার শব্দ আমার শব্দ
শব্দ নানা রকম,
ভাবছো তুমি কেনই এত
বকম বকম বকম।

শব্দ আছে মনের মাঝে
গোপন ডেরা জুড়ে
শব্দ ভাঙি শব্দ জুড়ি
আকাশ আস্তাকুড়ে।

শব্দ নিয়েই শান্তিভাঙে
ডিজের বিষম ঝড়ে,
শব্দ দিয়ে জীবন মরণ
রাজার আসন নড়ে।

শব্দ দিয়েই দস্যুরা সব
ভাঙে হৃদয় দেশ
কালের গর্তে মিলিয়ে যাবেই
(তাদের) তাণ্ডবেরই রেশ।

শব্দ দিয়েই চুপি কথা
মনের মাঝে খুঁজি,
যন্ত্রণা সব লাঘব করে
একসাথে হই রাজি।

কোনটা ভালো কোনটা খারাপ
হিসেব করো তুমি,
মানুষ গড়ার মননজগৎ
জানে অর্ন্তযামী।



শিয়াল ও ডাহুক পাখি ■ সাহেব মণ্ডল

শিয়াল-পোঁতার পুকুর পাড়ে যেই উঠেছি গিয়ে,
ঘাসের বোঝা মাথায় করে কাস্তে হাতে নিয়ে,
চমকে দেখি একটা শিয়াল ভেড়ির উপর শুয়ে।
মাথার বোঝা নামিয়ে রেখে, কাস্তে খানা থুয়ে...
ভাবছি মনে – শিয়াল ভায়া আছে কি ঘুমিয়ে?

সাহস করে এক-পা, দু-পা এগিয়ে গিয়ে দেখি,
শিয়াল ভায়ার মুখে ধরা আস্ত ডাহুক পাখি।
ডাহুক পাখির জান ধুকপুক, তখনও সে জ্যান্ত,
শিয়াল ভায়ার চোখ ছল্ ছল্, বোধহয় পরিশ্রান্ত!

ভাবছি মনে – সংগোপনে এগিয়ে আরো কাছে
শিয়ালভায়ার পিঠের 'পরে মারব লাঠি খেঁচে,
ধূর্ত শিয়াল খুলবে চোয়াল, ডাহুক যাবে বেঁচে।

পরক্ষণে ভাবছি এও – শিয়ালটা কী খাবে?
মুক্তি পেয়ে ছটপটিয়ে ডাহুক তো পালাবে!
তার থেকে থাক 'খাদ্য-খাদক' ভগবানের হাতে,
সবটা ভেবে চলতে হবে সর্বদা সৎ-পথে।

শালিখ পোষা ■ প্রদীপ সেনগুপ্ত

এক শালিখে দুঃখ বাড়ে
দুই শালিখে খুশি
তিন শালিখে চিঠি আনে
তাই-তো শালিখ পুষি
আমি তাই-তো শালিখ পুষি।

দুঃখ কিনি যখন যে চাই
সুখ চাইলে তাও খুঁজে পাই
গন্ধ চিঠি আসলে মন
হয় যে-রে ফুলটুসি।।

আংটি, তাবিজ পাথরেতে -
ধরতে চায় কেউ বরাত?
আমি শুধু পাখি পুষে
ভাগ্যকে নিই এক হাত।
পাখি দিয়েই ভাগ্য ফেরাই
ঘরের দাওয়ায় বসি
আমি তাই তো শালিখ পুষি।

হঠাৎ শালিখ অক্কা পেলো
চারটে থেকে একটা হলো -
দুঃখ আমার জনম সাথী
যতই যে ছক্ কষি।

মিথ্যে আমার পাখি পোষা
মিথ্যে আমার হিসাব কষা

সোনার হরিণ সুখকে, মিথ্যে শুধুই খোঁজা
ভাগ্যটাকে পাল্টানো নয় তো অত সোজা।



দর্পণ ■ সুরজিৎ ভট্টাচার্য

অমৃত সমান পুত্র মোরা
মৃত সর্বক্ষণ,
চেতনা, শিক্ষা, নীতি, ধৈর্য্য
সবই বিসর্জন।
অধিকারে বিশ্বাস মোদের
কর্তব্যেতে নয়,
এদিক ওদিক সেদিক খুঁজি
বিশ্বাসে নয় নয়।
তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে মোদের
ভুল ধরতেই ব্যস্ত,
নিজের ভুলের ভরাডুবি
ডুবল মোদের স্বাস্থ্য।
দীর্ঘ দিনের সাধনাতে
এটাই মোদের শিক্ষা,
কর্ম কর যত যত
(ছাড়) ফলাফলের
তিতীক্ষা।

আনন্দে মন নাচছে ঘোড়া ■ অসীম দাস

ভোর না হতেই ঘুম ভেঙেছে
আজকে মাঘের মেলা,
শীতের কাঁপন দিক ভুলেছে
গড়িয়ে যাচ্ছে বেলা।

কুশল, কিশোর কোথায় তোরা?
দুপুর হয়ে এলো,
আনন্দে মন নাচছে ঘোড়া
সন্ধ্যে এলোমেলো।

চল্ চল্ চল্ খুব জমেছে
নাগরদোলায় ভীড়,
পুতুলনাচের গেট খুলেছে
পান্তুয়াতে ক্ষীর।

সার্কাসে সাত বাজনা বাজে
ম্যাজিক জ্বালায় আলো,
ওই দেখা যায় জোকার সাজে
ভেতর কি জমকালো।

কোনখানে যে যাবো আগে
ভেবেই দিশেহারা,
জমিয়ে রাখছি ভাগে ভাগে
হবো না কোল-ছাড়া।



লাল সাইকেল ■ দীপান্বিতা হক

লাল সাইকেল রাখা আছে সিঁড়ির কাছেই নীচে
সকাল-বিকেল চালাই তাকে পাঁই পাঁই পাঁই খিচে।
ব্যালেন্স চাকা খুলে দিতেই মা কেন ভয় পায়?
এক আধবার পড়ে গেলেও ব্যথা আমার সয়।
পাশের বাড়ির টুনি, মণি, পেছন সিটের সওয়ার
পাড়ার মাঝেই চক্কর দিই দিনের মধ্যে বারবার।
সেদিন ছিল মেঘলা বিকেল, সওয়ারী ছিল টুনি
প্যাডেল দশেক যেতেই বৃষ্টি, পিছলে পড়ে দুনি।
কাদার থেকে উঠেই টুনি, খামচে ঘুঁষি মারল
ম্যা ম্যা বলে কেঁদে আকাশ ফাটিয়ে শুধু ভরল।
নিজের ব্যথা দুঃখ ভুলে লাল সাইকেল তুলি
টুনিকে আর সওয়ারী না, বলে নিজের কানটি মলি।।

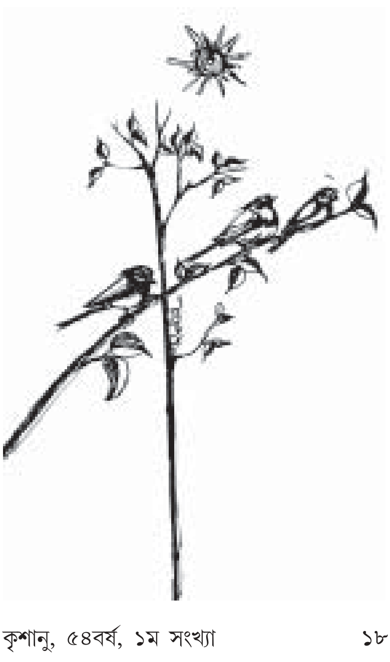
খেলে যাও ■ ক্ষুদিরাম নস্কর

ঘর মানে তো খোলা ফুটপাত,
কাটে রাত মুড়ে চট প্লাস্টিক।
সংসার সে তো মা বোন আমি,
কিছুতে চলে না ঠিক ঠিক।

বাবুদের বাদ পোশাক পেলে,
শীত টুকু যায় টেনেটুনে।
মা বলে যায় পয়সা দিয়ে,
খরচ করিস দেখেশুনে।

রোজ ভোরবেলা ভাইবোন মিলে
রোদ্দুর ডাকি; এসো এখানে।
চৌরাস্তার মোড় পাশে রেখে
ট্রাম লাইন এর শেষ যেখানে।

ভাঙ্গা কান্নার অশ্রু শুকোয়
রাস্তার মাঝে ছোপ দাগ পেলে –
তবেই বুঝবে ঠিক রাস্তা,
আমাদের সাথে যাও খেলে।



বকবকানি ■ মনোজ জানা

ঘরের পাশে তেঁতুল গাছে
নানান পাখির বাসা আছে।
শান্তশিষ্ট কেউ বা রঙিন
একটি বাসায় সমগ্র দিন
দুটো বকের বকবকানি চলে,
জানি না ওরা কী কথা বলে।

চুপ করে রই গাছের নীচে
শুনব কথা সত্যি-মিছে।
আর যে আছে প্যাঁচা-পেঁচি
নেই তো তাদের চেঁচামেচি,
এত সুন্দর ছোট ছোট ঘরে
বকরা কেন ঝগড়াঝাটি করে?

বাবা কন, 'ওরা ডিম পাড়বে
কচিছানা সব ঠ্যাং নাড়বে।
কম তো পড়বে ঝিলের পুঁটি
চিন্তায় আছে সারস দুটি,
ও সমস্যা এখন বিশ্বজোড়া –
বেশি গাছ লাগাতে বলছে ওরা।'

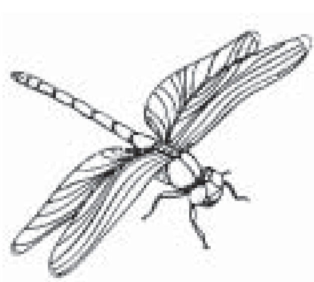
ফিরে আসা ■ কৃপাণ মৈত্র

গাছ গাছালির কত কত ভাষা
পাখিদের কাকলিতে
নীড়ে জেগে রয় কত ভালোবাসা
আহৃত অমৃতে।

সেই সে কখন জানায় আকাশ
ডিঙিয়ে মেঘের সারি
নেতানো সূর্যে খালি অবকাশ
ঠোঁটে ঠোঁটে সংসারি।

এভাবেই ভ্রমে মনের বাগানে
অলিকুল অহরহ
ফিরে যেতে হয় মান অভিমানে
হোক যত দুঃসহ।





রাজ ফড়িং ■ হরেকৃষ্ণ দে

ও রাজ ফড়িং রাজ,
ওড়াই কি তোর কাজ!
মন ভোলানো সাজ।
ফড়ফড় করে উড়িস,
ডানাগুলো তুই মেলিস,
হাঁটু দিয়ে কথা শুনিস।
লেজটা তোর নরম,
নেইতো তোর শরম,
ভালোবসিরে চরম।
তুই আর উড়িস না
একটু তুই বোস না
ফড়ফড় করিস না
ফড়িংদের তুই রাজা,
কেউ দেবে না সাজা,
খাবি তো আয় খাজা।
বসতে দেব ভুঁই,
আদর করে ছুঁই,
রাজ ফড়িং তুই।

চিড়িয়াখানা ■ আশীষ ঘোষ

শীতের সকাল ছুটির দিনে এসেছি আজ চিড়িয়াখানা,
ঢুকেই দেখি পথের পাশে বাঁদর ভায়া আছে দশখানা।
শিম্পাজিটা বেজায় কুঁড়ে বসে আছে খাঁচার কোণে,
বনের রাজা কেশর নেড়ে দিচ্ছে টহল আপন মনে।
একটু গিয়ে ডানপাশে যে পরিখা আর উঁচু দেওয়াল,
তার ওপারে ভূরিভোজে ব্যস্ত দেখি বাঘ রয়েল বেঙ্গল।
শান্ত ডিয়ার বিয়ার, জেব্রা জিরাফ হাতি গণ্ডার নীলগাই,
হায়না চিতা নেকড়ে শিয়াল বনবিড়ালের গন্ধে পালাই।
জলে দেখি জলহস্তী, ভোঁদড়, কচ্ছপ, ঘড়িয়াল ও কুমির,
সাপ আছে নানান জাতের নানা রঙের গা করে শির শির।
সবার শেষে পাখির দেশে খাঁচার ভিতর রঙের মেলা,
ময়না বুলবুলি দোয়েল চন্দনা পাপিয়া করছে খেলা।
মস্ত ডানা ঈগল, শকুন, ধনেশ, ময়ূর, এমু ও ম্যাকাও,
বাঁকা ঠোঁটের টিয়া, চিল, পেঁচা ঝুটিওয়ালা কাকাতুয়াও।
আরো আছে বহু পাখি কিছু চেনা কিছু নাম না জানা,
ফুলের বুকে উড়ছে দেখি প্রজাপতি মেলে রঙিন পাখনা।
একটা কথা সবার শেষে, চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়ে,
মোরা মানব নিয়ম কঠোর ভাবে জীব-জন্তুর বন্ধু হয়ে।



ফুটপাতের ঐ ছেলেটি ■ ফটিক চৌধুরী

একটু শীতেই কাতর তুমি
একটু শীতেই কাঁপো
বসে বসে সারাটি দিন
তাপমাত্রা মাপো।

ফুটপাতের ঐ ছেলেটির
কথা কি কেউ ভাবে
শীতকালটি ঐ ছেলেটির
কেমন করে যাবে!

না আছে তার গরম পোশাক
না আছে লেপ কম্বল
আগুন জ্বেলে কাটায় রাত
ঐটুকু তার সম্বল।

আমরা কি কেউ ভাবি
আছে কি কোন বোধ?
দিনটি তার কাটে তাই
লাগিয়ে গায়ে রোদ।

এবার থেকে সবাই যদি
ওর কথা ভাবি
ফুটপাতের ঐ ছেলেটি
পাবে সুখের চাবি।



মনের মতো ■ বিদ্যুৎ মিশ্র

বাঁচার মানে পাই যে ফিরে ভুলে নিজের দুখ
তারার ভিড়ে যখন দেখি সেই মায়ের মুখ।
বলছে যেন আমার খোকা ভীষণ ভালো ছেলে
ভালো থাকিস নিজের মতো সব যাতনা ফেলে।

গাঁয়ের মাটি হাত বাড়িয়ে আমায় যেন ডাকে
সবুজ ক্ষেত পাহাড় নদী আগলে তারা রাখে।
নিজের মাটি ভীষণ খাঁটি নাড়ির যেন টান
এই মাটিকেই শ্রদ্ধা করি আমার সম্মান।

অভাব যতো বুকের মাঝে গুমরে যেই ওঠে
ভালোবাসার পরশ পেলে তখন হাসি ফোটে।
পরের দুখ দেখলে তাই উদাস আমি হই
মনের মতো মানুষ পেলে বন্ধু তাঁকে কই।

আমার সত্যজিৎ ■ অষ্টপদ মালিক

জগৎজোড়া সুনাম তোমার
যার তুলনা নাই
তোমার লেখা বই পড়ে
কত শিক্ষা পাই।

'পথের পাঁচালী' ছবি দেখে
ভাবতে যখন থাকি
অপু দুর্গার জীবন ছবি
মনের মাঝে রাখি।

অপু কাঁদে দুর্গা কাঁদে
করুণ ফলাফল
ওদের দেখে বাগ মানে না
আমার চোখের জল!

অমর সৃষ্টি অমর কথা
জীবন জয়ের ভিত
'অস্কার' জয়ী জগত সভায়
প্রিয় সত্যজিৎ।



আঁকতে পারি ■ কার্ত্তিক মণ্ডল



আঁকতে পারি ছোট্ট একটি গ্রাম
মধ্যিখানে বইছে ধীরে সোঁতা
বর্ষা এলেই ময়ূর পেখম মেলে
কাক কোকিলার খুনসুটি প্রেম কথা।
আঁকতে পারি ছোট্ট ডিঙি মাঝি
বাঁশঝাড় আর খ্যাঁক শেয়ালের খল
তিড়িং তিড়িং নাচছে মোরাল পুঁটি
কাদাখোঁচা সারবাঁধা বক দল।
আঁকতে পারি নদীর ঘাটের পারে
বাসন মাজা ছোট্ট গাঁয়ের বধু
গাছগাছালি ঝিলিক লাগা আলো
এই টুকুনি আঁকবে তুমি শুধু।

খাদ্যে ভেজাল কখনো নয় ■ অলোক শ্রীমানী

বিজ্ঞানীরা সব বুঝেও
কেন যে তবু, বলছে না,
সব কিছুতে দিলেও ভেজাল
খাদ্যে ভেজাল চলবে না।

রাজনীতিতে চলছে ভেজাল
এদিক ওদিক দুলছে সব,
সব কিছু তার নিলেও মেনে
খাদ্যে ভেজাল সব নীরব।

নেতার বক্তৃতাতে ভেজাল
ঠিক মত সব দিচ্ছে না,
বলুক ওরা শপথ করে
খাদ্যে ভেজাল চলবে না।

রাসায়নিক সার যাচ্ছে পেটে
রোগ জীবাণু, বাড়ছে ব্যাধি
মিথ্যে কথাও সহ্য হয়
খাদ্যে ভেজাল না থাকে যদি।

ধর্মে ভেজাল দিচ্ছে দিক
সব ধর্মেই হচ্ছে চুরি,
রাম, রহিম, পিটার সবাই করে
পার্থক্য ওদের ঊনিশ কুড়ি।

দেশের রাজা ভেজাল রোকো
মানুষ এবার, ধ্বংস প্রায়,
সব কথাতে দিলেও ভেজাল
খাদ্যে ভেজাল কখনো নয়।

পরিচয় ■ বিকাশ যশ

বোঝনি কখনো মানব বেদন
উড়ায়ে সখের ঘুড়ি
জনতার কাছে রেখেছ দাবি
কানে দিয়ে সুড়সুড়ি।
ভেদাভেদ শুধু রচিলে তোমরা
হাটের পসরা নিয়ে
বোঝনি কখনো দুঃখের জ্বালা
দুখির দুয়ারে গিয়ে।
আকাশ-কুসুম ভেবেছো শুধুই
সুখ আসে যদি তাতে
মুখের অন্ন করনি তো ভাগ
মিলেমিশে এক সাথে।
সাম্য যে হায় সমাধিত আজ
লৌকিকতার মোড়ে
এখনি তোমরা হও সচেতন
থেকো না ঘুমের ঘোরে।
ভালোবাসা রাখো বুকের ভিতর
কর এ বিশ্বজয়।
পৃথিবীর বুকে আমরা মানুষ
এই হোক পরিচয়।

শতবর্ষে সত্যজিৎ ■ অনুপকুমার আচার্য

ছবি তোলেন
ছবি আঁকেন
কখন লেখেন গান
গলা সাধেন
সুর বাঁধেন
বাংলাদেশের প্রাণ
নিজের গল্প
তাও কি অল্প
ছোটবড় ছোটে
তৈরি ছবি
ছবির কবি
সাহেবসুবো জোটে
ভাল মন্দ
স্বাদ গন্ধ
হেঁয়ালিতে সব বাঁধা
নেই বন্দুক
কোন নিন্দুক
ফেলু মিত্তির দাদা
কত কেতাব
জয়ী খেতাব
বাবু সত্যজিৎ
কত হর্ষে
শত বর্ষে
মানিকদা নন 'মিথ'!



ক্যাঙারুর স্কুলে যাওয়া ■ চৈতালী রায়

ক্যাঙারুর ছেলেগুলো ধরেছে যে বায়না
আজ থেকে স্কুলে যাবে দেরি আর সয় না।
ভূগোলের ম্যাপখানা দেওয়ালেতে দেখেছে
নদী আর পাহাড়ের উঁচু নীচু বুঝেছে।
দেশগুলোর সীমারেখা ভালো করে দেখেছে
পশ্চিমের দেশগুলোর আবহাওয়া জেনেছে।
ইতিহাস পড়ে বলে এইবার বুঝেছি
মানুষের ছেলেগুলো শুধু এটা জানে কি!!
ইংরেজী বড় সোজা হ্যাট, ব্যাট জানলেই
বাকিগুলো এসে যাবে মন দিয়ে পড়লেই।
অঙ্কতে মাথা লাগে শুনেছি তো এতকাল
ক্যাঙারুর ছেলে হয়ে ধরবো না এই হাল!!
বিজ্ঞানে জ্ঞান আছে এতো জানো সকলেই
স্কুলে গেলে জ্ঞানটুকু আর একটু বাড়বে।
বাংলা, হিন্দি নিয়ে পড়েছি যে ফ্যাসাদে
কোনটা শিখলে পরে কাজ হবে সহজে।

শতবর্ষের প্রণাম ■ অনরণ্য মজুমদার

গুপি বাঘার গানের সুরে হীরক রাজা হাসে
আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে।

মগজাস্ত্রের কিস্তিমাতে সোনার কেল্লা জয়
'জবর বারো'র পাতায় পাতায় অনাথ বাবুর ভয়।

গিরিডির সেই ত্রিলোকেশ্বর-পকেটে আনাহাইলিন
রূপকথা ও বাস্তবতার সীমারেখা বিলীন।

তারিণী খুড়োর চায়ের কাপে দেশ বিদেশের কথা
অপু দুর্গার দুষ্টুমিতে স্বপ্নের মেঘ মাখা।

অরণ্যে আজ দিনরাত্রি আর হবে না হায়
শতবর্ষের শত প্রণাম – সত্যজিৎ রায়।



গ ল্প মা লা

হাবুল ■ পার্থ প্রতিম সামন্ত

ভোর ৫টা ৪৫ মিনিট। মেচেদা স্টেশন। মেদিনীপুর লোকাল। অমিত ট্রেনের জানালার ধারের সিটে বসে আছে আনমনা হয়ে।

অমিত সবে একটা সরকারি অফিসে কাজ পেয়েছে। সল্টলেকের বিডি ব্লকে তার অফিস। প্রতিদিন মেচেদা স্টেশন থেকে পৌনে ৬টার মেদিনীপুর লোকাল ধরে হাওড়া স্টেশনের উদ্দেশ্যে।

চারপাশে অনেক হকার ঘুরছে। একটা ছোট্ট ছেলে অমিতের মুখের সামনে একটা পেপার ধরে বলল, খবরের কাগজ নেবেন? অমিত বলতে কিছু যাচ্ছিল ছোট্টো ছেলেটি বলে উঠল, নিন না তা হলে আমার বড়ো উপকার হয়। অমিত একবার দেখল ওর মুখের দিকে। খুবই ছোট্ট একটা ছেলে। মিষ্টি হেসে জিজ্ঞাসা করল, নাম কি রে তোর?

সে বলল, সৌমেন রায়। সবাই আমাকে হাবুল বলে ডাকে। অমিত বলল, বাঃ বেশ নাম তো তোর। এইভাবে ক্রমে আলাপ জমে উঠল। ট্রেন তখনও ছাড়েনি। ওর সাথে আলাপ হওয়ার পরই বুঝতে পারল যে, আমরা যেভাবে জীবনটাকে উপভোগ করছি আসলে সেটা কোনো জীবন-সংগ্রামই নয়। দিনরাত যে ধরনের জীবনবোধ, সুখ-দুঃখ নিয়ে মাথা ঘামাই সেটা যে আসল জীবনই নয় – তা অনুভব করল। আমাদের চারপাশে এমন মানুষও আছে যাদের জীবন-যন্ত্রণা বিধাতা অন্যভাবে লিখেছেন। সেটা এইটুকু ছেলেটার সঙ্গে পরিচয় না হওয়া পর্যন্ত অমিত উপলব্ধি করেনি কোনোদিন।

হাবুলের সেই মিষ্টি সুর করে পেপার বিক্রি করা অমিতের খুব ভালো লাগত। এইভাবেই কিছু দিন চলতে লাগল। হাবুল যখনই ওর কাছে আসত – ওর ভিতর থেকে সে একটা অদ্ভুত আর্তনাদ শুনতে পেত। অনেকবারই মনে হয়েছিল বাচ্চাটার সাথে আলাপ করার কথা। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি।

অমিত একদিন ঠিক করেছে যে আজ আর অফিস যাবে না, হাবুলের সাথে দেখা করবে। পরের দিন খুব ভোরে সে মেচেদা স্টেশনে চলে যায়। সে নির্দিষ্ট ট্রেনটায় উঠে দেখে, হাবুল দাঁড়িয়ে আছে পেপার দেবে বলে। সে বলল, হাবুল তোর সাথে কিছু কথা আছে।

হাবুল বলল, বল কি বলবে।

অমিত মনে মনে ভাবতে লাগলো, যে বয়সে ছেলেটার হাতে বইপত্তর থাকার কথা, যার এখন খেলে বেড়ানোর সময় – সেই নিষ্পাপ শিশুটির শৈশবের কাঁধে উপার্জন করার বোঝা! যখন তার পড়াশুনা করে, বাবা মায়ের আদরে ভালোবাসায় জীবন কাটানোর কথা,

তখন সে হাতে খবরের কাগজ বিক্রি করার রাস্তা কেন বেছে নিয়েছে!

হাবুল আবার বলল, বল – কি বলবে।

অমিত বলল, হ্যাঁ, বলছি কি, এই বয়সে তুই এ লাইনে কেন? তোর বাড়িতে কি কেউ নাই?

হাবুলের বাড়িতে ওর বাবা, দিদি আর ও। বছর কয়েক আগে ওর মায়ের মৃত্যু হয় হার্ট-অ্যাটাকে। বাবা-মা দিনমজুর। খুব দারিদ্রের মধ্যে ওদের জীবন চলত। হঠাৎ ওর বাবার একটা বাস দুর্ঘটনায় আজ দু'বছর ধরে কোমায় পড়ে আছে। দিদি সেলাই করে কোনোরকমে সংসার চালায়। বাবার চিকিৎসা, সংসার চালানোয় যেন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তাই দিদির হাতে হাত লাগাতে সে এই পেপার বিক্রির লাইনে।

– তা তুই তো সরকারি স্কুলে যেতে পারতিস। খরচ লাগতো না। তুই ভর্তি হবি? আমি ব্যবস্থা করে দেব। হাবুল বলল, না গো দাদাবাবু। আমার হাতে সময় নাই একদম। অমিত খুব একচোট হেসে বলল –

কেন রে, পড়াশুনা করতে ভয় লাগে?

হাবুল স্থিরভাবে মাথা নিচু করে বলল, সত্যিই একদম সময় নাই।

তুমিই বল, বাবা তাড়াতাড়ি সুস্থ না হলে দিদি কি করে একা সব সামাল দেবে? অমিত বুঝল, এই ছোট্ট শিশুটা বড্ড তাড়াতাড়ি কখন যেন অনেক বড় হয়ে গেছে। ওর চোখে জল। হাবুলকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুই আমাদেরকেও এই বোধটা দে।

আরো অদ্ভুত লেগেছিল এটা জেনে যে, ও কারো কাছ থেকে এক টাকাও সাহায্য নিত না। কারণ, হাবুল কারো কাছ থেকে সাহায্য নিলে নাকি ওর লড়াইটা হার মেনে যাবে। সত্যি যে ওইটুকু একটা ছেলের মুখে এরকম এই একটা ভাবনা চিন্তা ওকে অবাক করে দিয়েছিল। এমনকি সে যদি কোনো সময়ে ওকে টাকা দিতে যেত, তাহলে ও একগাল হেসে তার কাছে এসে একটাই কথা বলত, দাদাবাবু সাহায্য, দয়া তারাই নেয় যাদের কোনোকিছু করার থাকে না। আর আমায় তো ভগবান সবকিছুই দিয়েছে করার জন্য, তাহলে আমি কেন লোকের কাছে হাত পাতব?

তবে সেই দিনই অমিত বুঝেছিল যে, সত্যি ভগবান বলে কিছুই নেই, শুধুই পাথর। যদি থাকত তাহলে এতটা নিষ্ঠুর হতে পারত না।

অমিত বলল, এতকিছু জানার বোঝার পরও তুই ভগবান বিশ্বাস করিস?

ও বলল, দাদাবাবু – মা বলতো, আমাদের আশাটাই যে ভগবান। তুমি কোনোকিছু আশা করলেই ভাববে যে ভগবান আছে। আর যদি কোনোকিছু আশা না করো তাহলে ভগবান নেই। আর আশা ছাড়া যে বেঁচে থাকা যায় না। তাই ভগবান বিশ্বাস করি।

– ওঃ, কি অদ্ভুত দর্শন এতটুকু ছেলের মধ্যে।

হাবুলের মুখে এই চারটি লাইন শুনে অমিতের এতদিনের জ্ঞান, এতদিনের শিক্ষা সব কিছুই ওই ৯-বছরের শিশুটির কাছে খুব তুচ্ছ মনে হতে লাগল। তবে এত কষ্ট এত দুঃখ নিয়েও কখনো সে হাবুলকে মন খারাপ করতে দেখেনি। ওর মুখে সবসময় একটা মিষ্টি হাসি লেগে থাকত, কিন্তু সেই হাসিটির ভিতরে যে একটা আর্তনাদ লুকিয়ে থাকত সেটা ও কাউকে বুঝতে দিত না।

কয়েক মাস এইভাবে কেটে গেল, হঠাৎ কয়েকদিন হাবুলের দেখা নেই। তারপর সেই চেনা চিৎকার করা কণ্ঠটা অন্যরকম লেগেছিল। তাকিয়ে দেখল, একটা লোক পেপার বিক্রি করছে। কিন্তু এখানে ওনার জায়গায় তো হাবুলের থাকার কথা। তাহলে ইনি কেন?

লোকটির সাথে কথা বলে জানতে পারল যে হাবুল হাসপাতালে ভর্তি। অমিত কোনোরকম লোকটির কাছে হাসপাতালের ঠিকানাটা নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছল। হাসপাতালে সে রকম উন্নত মানের কোনো যন্ত্র, অত্যাধুনিক সুবিধা কিছুই নাই। হাবুলের ধুম জ্বর, চোখ বুঁজে বেডে শুয়ে আছে। অমিত অসহায় গলায় ডাকল – হাবুল!

হাবুল কষ্টে চোখ মেলল, চোখ দুটো লাল, কষ্টে বলল – কাগজ নেবেন? অমিতের দুচোখে জল এসে গেল।

ডাক্তারবাবু বললেন – ওর জ্বর ছাড়ছে না, রক্ত পরীক্ষা করা দরকার, এখানে কোনো ব্যবস্থা নেই, আমি অসহায়।

অমিত ডাক্তারবাবুর হাতে ধরে কাতর গলায় বলল – আমি রক্ত পরীক্ষা করিয়ে আনব, ওষুধ কিনে আনব, ব্যবস্থা করে দিন, ওকে সারিয়ে তুলুন ডাক্তারবাবু।

অপার তৃপ্তি ■ সুজিত ভট্টাচার্য

ছোটমামা এসেছেন। স্বভাবতঃ ঝুনু, ঝিনুক, ঝিমলি অত্যন্ত খুশি। অনেক দিন পর ছোটমামাকে কাছে পেয়েছে তারা। দীর্ঘদিন গৃহ বন্দী। ছোটমামা তাদের কাছে এক ঝলক স্বস্তির হাওয়া। বাবার কড়া শাসন, মায়ের তীক্ষ্ণ নজরদারি থেকে একটু রেহাই।

আজ রথের মেলা। নুনিয়া নদীর ধারে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দোকানিরা আসে তাদের পসরা নিয়ে। সেই সঙ্গে নাগরদোলা, মাদারি খেল, ম্যাজিক আরও কত কি! উপরি পাওনা পাঁপড় ভাজা আর গরম জিলিপি। কি মজা! অনেক দিন পর প্রাণ খোলা কিছু আনন্দঘন মুহূর্ত। ঝুনু, ঝিনুক, ঝিমলি মামার কাছে আব্দার জানাল রথের মেলা দেখতে যাবে। ছোটমামা বললেন, মধ্যাহ্ন ভোজ সেরে আমরা রওনা দেব। সকলে মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার নেবে।

তর সইছে না ঝুনুদের। উত্তেজিত তারা। কখন দুপুর হবে, খাওয়া দাওয়া শেষ হবে, আর ছোটমামার সঙ্গে রথের মেলায় যাবে!

সকলে মিলে গোল হয়ে মেঝেতে খেতে বসল। বাবার অফিস। বাবা অনুপস্থিত। এক এক করে খাদ্য সামগ্রী এসে পড়ল। মায়ের সাথে হাত লাগাল ঝিনুক। ছোটমামা মাকে বললেন, দিদি তুইও বসে পড় এক সাথে।

আমি পরে বসব। তোদের হোক।

না না এক সাথে বসে পড়। সবাই নিজের হাতে নিয়ে নেবে। তুই বসে পড়। মামার সাথে ঝুনুরাও মাকে অনুরোধ করল।

খাওয়া দাওয়া শেষ। উঠে পড়ল সকলে। মেলা যাবার জন্যে ভাগ্নে ভাগ্নীরা প্রস্তুত। ছোটমামা মাকেও সঙ্গে যেতে অনুরোধ করল। উত্তরে মা বললেন, নারে তোর জামাইবাবু অফিস থেকে এলে চা জলখাবার দিতে হবে। আমি গেলে অসুবিধা হবে। মার অসম্মতিতে ঝুনুরা খুশি। মা গেলে নানান বিধিনিষেধ। এটা খাস না, ওটা করিস না ইত্যাদি ইত্যাদি।

জমজমাট মেলা। প্রচুর লোকসমাগম। চারিদিকে মাইকের শব্দ। খাবারের গন্ধে ম ম করছে মেলা প্রাঙ্গন। ঝুনুর মুখে জল। ঝিনুক ঝিমলির চক্ষু উদ্ভাসিত। মনের গহনে আনন্দের স্রোতধারা।

ঝিনুক ঝিমলি ফুচকা খাবে। ঝুনু খাবে জিলিপি। ছোটমামার পছন্দ সব খাবার। সকলে মেলা প্রাঙ্গন এক চক্কর দিল। নাগরদোলা চড়ল। ম্যাজিক দেখল। কিছু কেনাকাটা

করল। অবশেষে দাঁড়াল ফুচকাওয়ালার সামনে। ঝুনু ছোটমামাকে বলল, মামা তুমি ওদের সাথে ফুচকা খাও আমি বরং পাঁপড় আর গরম গরম জিলিপি খেয়ে আসি।

অন্য সময় ঝিমলি ঝিনুক গুনে গুনে ফুচকা খায়। আজ বাধাহীন। কে কত ফুচকা খেতে পারে তার যেন প্রতিযোগিতা। কে কটা খেল কেউ তার হিসেব রাখেনি। ছোটমামা পয়সা মেটাল। তারপর সকলে ঝুনু যেদিকে গেছে সেই দিকে প্রস্থান করল।

সাত আট বছরের অর্ধ নগ্ন একটি ছেলে। জীর্ণ মলিন। জিলিপির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। দৃষ্টি জিলিপির দিকে। বড় করুণ দৃশ্য। তাকে দেখে কষ্ট অনুভব করল ঝুনু। ব্যাথায় ভরে উঠল অন্তর। সে পরম স্নেহে ছেলেটিকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করল জিলিপি খাবে কিনা? উদ্ভাসিত মুখ। ঠোঁটে এক চিলতে পবিত্র সরল হাসি। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল সে। ঝুনু দোকানিকে জিলিপি দিতে বলল। একের পর এক। গোগ্রাসে গিলছে শিশুটি। মনে হল অনেক দিন অভুক্ত। খেতে খেতে এক ঐশ্বরিক স্নিগ্ধ জ্যোতি প্রকাশ পাচ্ছিল তার চোখে মুখে। সেই জ্যোতির আলোক মুর্ছনায় নিজেকে সিঞ্চিত করছিল ঝুনু। মগ্ন একাগ্র চিত্তে। পরম শান্তি বিরাজিত তার হৃদয়ে। সম্বিৎ ফিরল ঝিনুকের ডাকে, দাদা...। মগ্নতা ভাঙতেই ঠোটে অঙুল চাপা দিল ঝুনু। ইশারায় চুপ করতে বলল। সকলে নির্বাক দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল ছেলেটিকে। খাওয়া শেষ হল এক সময়। ঝুনু জিজ্ঞেস করল আর খাবে কিনা? মাথা নেড়ে ছেলেটি জানাল না।

ঝুনু পরম যত্নে ছেলেটিকে তার কোমল হাতের স্পর্শে আদর করল। এক অসহায় অনাথ গরিব শিশুকে সাময়িক আনন্দ দিয়ে সে নিজেও পরম তৃপ্তি অনুভব করল।

বুড়ির বুদ্ধি ■ গোপাল চন্দ্র হালদার

আমাদের ছেলেবেলার কথা। ঠাকুমা দিদিমার মুখে গল্প শুনতে খুব ভাল লাগত। নানা ধরনের গল্প। বললে হবে না তাঁরা অশিক্ষিত, লেখাপড়া শেখেননি। অনেকেই পাঠশালার গণ্ডি পেরতে পারেন নি, তাতে কি? সেই শিক্ষাই তাদের গর্বের ছিল, বলতো, 'তোদের মত হাই স্কুলে পড়িনি বটে, তবে পাঠশালে যেটুকু শিখেছি একেবারে খাঁটি।' সত্যি কথা। সেই বিদ্যেতে রামায়ণ, মহাভারত, ব্রতকথা সুর করে গড়গড় করে পড়ে যেতেন। আর ঠাকুমা-দিদিমার ঝুলিতে বেশি মজার মজার গল্প জমা থাকত। আর নাটকীয় ভঙ্গিতে এমন ভাবে বলে যেতেন যে, গল্পকে গল্প, সঙ্গে অল্পবিস্তর অভিনয়ও দেখা যেত।

রাতে ভাত হতে দেরি আছে। প্রাইভেট মাস্টারমশাই পড়ার ছুটি দিয়ে চলে গেছেন। আমরা খুড়তুতো জাড়তুতো ভাইবোন মিলে জনা আষ্টেক ঠাকুমাকে গিয়ে ধরলাম গল্প বলার জন্য। তিনি রাতের আহার দুধ-মুড়ি খেয়ে হাত ধুচ্ছেন। আমরা গিয়ে তক্তপোষে বসতেই তিনি বুঝে নিলেন, আজ ছাড়াছাড়ি নেই। গল্প না শুনে যাবে না। হাত মুছে মুখে দুটো জোয়ান ফেলে, আমাদের পাশে এসে বসলেন। বললেন, 'কি ব্যাপার। সদলবলে আক্রমণ?' আমরা বললাম, 'আজ একটা জব্বর দেখে গল্প বলতে হবে।' হাসতে হাসতে বললেন, 'আগেই বুঝেছি। তোমরা যখন দলবল নিয়ে এসেছ।'

তারপর বললেন, 'কিসের? ভূতের? আমরা বললাম, ভূতের গল্প অনেক শুনেছি। এবার অন্যরকম কিছু একটা বল।'



উনি বলতে শুরু করলেন, তবে শোন। আমার বাপের বাড়ি বাঁকুড়া। কাঁকুরে মাটির দেশ। ভাল ফসল হয় না। বেশির ভাগ লোকই গরিব। আরও খানিকটা উত্তরে ঘন শালবন। অনেকখানি এলাকা জুড়ে। দিনের বেলায় গেলেই গা ছমছম করে। লোকে বলে ঐ বনের ভেতরেই নাকি ডাকাতদের আস্তানা। ভেতরে আবার ডাকাত কালীর মন্দির আছে। ডাকাতের

দল লাল জবা ফুল দিয়ে মা কালীর পুজো দিয়ে ডাকাতি করতে বের হত। কপালে লাল চকচকে সিঁদুরের লম্বা তিলক। কানে গুঁজত লাল ঝুমকো জবার ফুল। হাতে লাঠি, বল্লম, টাঙি, তলোয়ার – এইসব অস্ত্র। রণপাও ছিল। দু'হাতে দু'টো গাঁটওয়ালা লাঠি নিয়ে তাতে পা দিয়ে সাঁ সাঁ করে হেঁটে যেত। একবেলার রাস্তা এক দেড় ঘণ্টায় মেরে দিত। তাও কি লাঠিতে ভর দিয়ে উঁচু পাঁচিল অতি সহজে ডিঙিয়ে পড়ত। কখনো বা লাঠিতে ভর দিয়ে একতলা ছাদের ওপর উঠে পড়তে পারত। এইসা চেহারা। লম্বা চওড়া। মুখে ভোজপুরি গোঁফ। সর্দ্দারেরা একাই ডাকাতি করত। দূরে দূরে কলাগাছ পুঁতে দিয়ে তার গায়ে মশাল গুঁজে দিয়ে জ্বালিয়ে দিত। তারপর লাঠিতে ভর দিয়ে বাড়িতে ঢুকে যেত। পায়ের কি জোর! দমাদম দু'চারটে লাথি মেরে সাধারণ দরজা ভেঙে ফেলত। শক্তপোক্ত হলে কোমরে গোঁজা ছোট কুড়ুল বের করে দরজার পাল্লা চেলিয়ে ফেলত। তারপর বাঁজখাই গলায় বলত, 'টাকাকড়ি সোনা দানা যা আছে তাড়াতাড়ি বের করে দে। নইলে সব কেটে কুঁচিয়ে ফেলব। বাড়ির লোক ভয়ে সব বের করে দিত। তারপর সেগুলো নিয়ে চম্পট দিত।'

'সেবার হয়েছে কি, আমার তখন বিয়ে হয়নি। রাতে তেলিপাড়ায় সুকো তেলির বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। বাড়ির বৌ-ঝিয়েরা কাঁদতে শুরু করেছে। পাড়ার লোক জেগে গেছে কিন্তু কাছে ঘেঁসতে পারছে না। রাস্তার মাথায় মাথায় পাকা বাঁশের তেল চকচকে লাঠি নিয়ে এক এক জন ডাকাত দাঁড়িয়ে। কাউকে দেখলে এমন হুংকার ছাড়ছে যে, যে শুনছে তার পরান ছেড়ে বেরিয়ে যায় আর কি? ভয়ে এগোতে পারছে না। মাঝে মাঝে দুমদাম আওয়াজ। দরজা, বাক্স, দেরাজ – এসব ভাঙছে বোধ হয়। সুকো তেলির তেজারতির কারবার ছিল। বন্ধকের অনেক সোনাদানা, পিতল কাঁসাও ছিল। সে সব বস্তা বন্দী করছে। সুকোটা বড় কেরেট ছিল। প্রথমে সিন্দুকের চাবি দিতে অস্বীকার করায় মাথায় মেরেছে এক লাঠির বাড়ি। মাথা ফেটে ঝরঝর করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

এদিকে হয়েছে কি, সুকোর মা বিধবা বুড়ি – বিশ্ব ঠাকুমা, বেশ বুদ্ধিমতি আর তেমনই সাহসী। তার ঘরটা সামনের দিকে। সেই ঘর দিয়েই বাড়ির ভেতর ঢুকতে হয়। বুড়ি মেঝেয় বসে যে সব ডাকাত বাড়িতে ঢুকছে তাদের পায়ে পড়ে কাকুতি মিনতি করছে। ছেলে মেয়েদের মারিস নি বাবা। ছেলে মেয়েদের মারিস নি বাবা। যা আছে সব নিয়ে যা – এভাবে ডাকাতদের পায়ে ধরে।

ঘণ্টাখানেক দাপাদাপির পর প্রতি ঘরের দরজায় শেকল তুলে দিয়ে ডাকাতরা চলে গেল। শাসিয়ে গেল, আবার যদি চিৎকার চেঁচামেচি করিস তো আবার ফিরে এসে কচুকাটা করে রেখে যাব।

ডাকাত দল চলে গেল। কিন্তু তখনও পাড়াপড়শির ভয় কাটেনি। তখন মিনিট পনের সবাই চুপচাপ থাকার পর, মোহন হাম্বির একটু সাহস করে বাড়িতে ঢুকল। দেখল, ডাকাত

দল সত্যিই চলে গেছে। প্রত্যেক ঘরের শেকল খুলে দিল। মোহনকে দেখে সবাই নতুন করে কান্না শুরু করল, 'আমাদের কি সর্বনাশ হল গো মোহন কাকা?' মোহনের পিছু পিছু পাড়ার লোকজন একে একে ঢুকতে শুরু করল। সুকোর সেই অবস্থা দেখে কেউ একজন ডাক্তার ডাক দিল। ডাক্তার এসে মাথায় ক'টা সেলাই করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। ওষুধও দিল।

এদিকে সুকোর মা বিশ্ববুড়ি বলে, তোরা বাবা তাড়াতাড়ি থানায় একটা খবর দে। তাড়াতাড়ি আসতে বল। ডাকাত দল ধরতে হবে তো? সবাই অন্য কথাগুলোর মানে বুঝলো, ডাকাত ধরার কথাটা বুঝতে পারল না।

সকালেই থানা থেকে দারোগাবাবু এলেন। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। বুড়ি দারোগবাবুকে নিভৃতে নিয়ে গিয়ে বলল, 'বাবা, ডাকাত ধরার কাজটা আমি অনেক সহজ করে দিয়েছি। আমি রাতে সব ডাকাতের পায়ে ধরার নাম করে খাটের নীচে থাকা আলতার বাটি থেকে আলতা নিয়ে তাদের পায়ে মাখিয়ে দিয়েছি। সেগুলো ধুয়ে ফেলার আগে তদন্ত করলে আমার মনে হয়, বেটাদের দু'চার জনকে ধরা যেতে পারে। আপনি আগে দাগী আসামীদের তুলুন, তাদের মধ্যেও কাউকে পেয়ে যেতে পারেন, যার পায়ে আলতার দাগ আছে।'

যেমন চিন্তা তেমন কাজ। দারোগাবাবু দাগী আসামীদের পাড়ায় গিয়ে সবকটাকে ডেকে জড়ো করলেন। দেখলেন জনা দু'য়ের পায়ে সত্যি আলতার আঁচড় টানার মতো দাগ। সঙ্গে থাকা কনস্টবলদের বললেন, এ কটাকে গাড়িতে তোল। থানায় নিয়ে চলো।

তারপর থানায় গিয়ে দু'টোকে এমন আড়ং ধোলাই দিলেন যে, বেটারা গড়গড় করে সবার নাম বলে দিল। গোটা দলটাই ধরা পড়ে গেল।'

এদিকে ভাত হয়ে গেছে। রান্নাঘর থেকে ডাক এলো, 'তোরা কোথায় রে সব। ভাত বেড়ে দিয়েছি। চুপচাপ সব খেয়ে নে।'



এখনও মানুষ ■ নিরুপম পাল

জৈষ্ঠ মাস প্রখর রৌদ্র। পাগলীটা প্রতিদিনের মতোই সেদিন দুপুরে বাড়ি থেকে একটু দূরে পুকুর থেকে স্নান করে বাড়ি ফিরেছে। তার সঙ্গে সব সময় একটা পুঁটুলি থাকতো। যেখানেই যাক পুঁটুলিটা সঙ্গে করে নিয়ে যেত। স্নান করতে যাওয়ার সময় পুঁটুলিটা সে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ফেরার পথে পুঁটুলিটা সঙ্গে আর নেই।

প্রথমে ব্যাপারটা লক্ষ্য করেন পাগলীর দাদা সমর চৌধুরী। বাড়িশুদ্ধ হুলুস্থুল বেধে যায়; কোথায় গেল পুঁটুলিটা? পাগলীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কোথায় রেখেছে কিছু মনে করতে পারে না। পুঁটুলিটা না পেয়ে সে তো কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। বাড়ির লোকজন সব বেরিয়ে পড়েছে পুঁটুলি খুঁজতে। পুকুর পাড় থেকে শুরু করে গ্রামের যে জায়গাগুলো পাগলীটার যাতায়াত ছিল সেসব জায়গায় খোঁজ করা হয়।

একটা পুঁটুলি নিয়ে এত খোঁজ কেনো? কি বা আছে তার মধ্যে?

সে প্রায় বছর ত্রিশেক আগের কথা। অমর চৌধুরীর ছোট মেয়ে অরুণার তখন বছর পনেরো বয়স। মুকুন্দপুরে চৌধুরী পরিবার বেশ বিত্তশালী। অনেক জমি জায়গা, বাক্স ভর্তি গয়না আর অনেক টাকা পয়সা আছে। অরুণা বেশ সুন্দরী শান্তশিষ্ট। মেয়ে বিবাহযোগ্যা হয়েছে। অমরবাবু মেয়ের জন্য পাত্র ঠিক করেন।

তেইশে ফাল্গুন অরুণার বিয়ে হয়ে যায় সোনারপুর গ্রামে সমীর রায়ের পুত্র বিকাশের সঙ্গে। বিবাহের ঠিক পনেরো দিন পরেই এক আত্মীয় বাড়ি যাওয়ার সময় বিকাশ ও অরুণা পথ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। ঘটনাস্থলেই বিকাশ মারা যায়। বেশ কয়েক মাস চিকিৎসার পর অরুণার শরীরে ক্ষত সেরে ওঠে কিন্তু সে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে।

বিকাশ মারা যাওয়ার পর শ্বশুরবাড়িতে আর অরুণার জায়গা হয়নি। সে তার সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে বাবার সঙ্গে মুকুন্দপুরে ফিরে আসে। অরুণার বাকি জীবনটা মুকুন্দপুরে কাটতে থাকে। নিয়মিত সে গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াত। লোকজনের সঙ্গে মাঝে মাঝে কিছু কথাবার্তা বলত। আবার আপনমনে বিড়বিড় করে বকতে বকতে সে বাড়ি ফিরতো। এভাবেই কাটতে থাকে অরুণার জীবন।

বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা পুকুর ছিল। সেই পুকুরে সেদিন স্নান করতে গিয়েছিল। সাথে যে পুঁটুলিটা ছিল সেটা সে পুকুরপাড়ে নামিয়ে রেখে স্নান করতে নামে। কিছুক্ষণ পর সে স্নান করে উঠে চলে যায়। পুঁটুলিটা পড়ে থাকে।

পুকুরের অদূরে বাড়ি এক বৃদ্ধ সচিদানন্দর। অরুণা চলে যাওয়ার পরে তিনি সেখানে স্নান করতে যান। পুকুরপাড়ে পুঁটুলিটা তিনি দেখতে পান। পুঁটুলিটা তুলে নিয়ে বাড়ি ফেরেন। কৌতুহলবশত পুঁটুলিটা খোলেন; উপরে গামছা জড়ানো, গামছা খুলতেই ভিতরে একটা

লাল মখমল কাপড় জড়ানো একটি পুঁটুলি। উপরের লাল কাপড় খুলতেই বেরিয়ে পড়ল সোনার গয়না। দেখেই তিনি অবাক হয়ে যান। এত গহনা তিনি আগে কখনো দেখেননি। বুঝতে পারেন পুঁটুলিটা পাগলীরই। মনস্থির করেন ফিরিয়ে দেবেন।

এদিকে পাগলীর বাড়ির লোকজন যারা পুঁটলির খোঁজে বেরিয়েছিল, পুকুরপাড়ে খোঁজ করার পর বাড়ি ফিরছিল। তাদের দেখে সচিদানন্দ দাঁড় করান এবং বলেন, আমি পুঁটুলিটা পেয়েছি, বাড়িতে আসুন। সবার মুখে তখন হাসি। সকলে তাঁর বাড়ি যায়। সচিদানন্দ ঘর থেকে পুঁটুলিটা এনে সমরবাবুর হাতে তুলে দেন। এক গরীব বৃদ্ধের সততা দেখে সবাই অবাক হয়ে যায়। সমরবাবুর চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরতে থাকে। বৃদ্ধকে তিনি জড়িয়ে ধরেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পকেট থেকে পাঁচশত টাকা বের করে তিনি বৃদ্ধকে দিতে চান। সচিদানন্দ টাকা নিতে রাজি হন না। বলেন, টাকা আমি নিতে পারবো না, আমি আপনাদের গয়না ফিরিয়ে দিতে পেরেই আনন্দিত হয়েছি। সমরবাবু বলেন, ভেবে অবাক হই যে পৃথিবীতে এখনও আপনার মতো মানুষ আছেন।

অনুগল্প

সুগার ■ রাজকুমার সরকার

চঞ্চল বোকারো'র একটি শো'রুমে একটি চারচাকা কিনে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছে। ওরা সবাই নতুন গাড়িতে ঘুরতে বের হয়েছে। পোস্ট দেখে ধানবাদ থেকে সনাতন লেখে, ভাই চঞ্চল, খুব খুশি হলাম।

এবার মিষ্টি নিয়ে একদিন বাড়িতে এসো।

চঞ্চল উত্তরে জানালো – দাদাভাই, আমি তো তোমার বাড়িতেই যেতাম সেদিন কিন্তু বৌদি বললো তোমার নাকি সুগার আছে....

একটি স্বপ্ন পূরণের গল্প ■ আশীষ ঘোষ

কৃং কৃং কৃং তিনবার সাইকেলের বেল বাজিয়ে রোজ ভোর পাঁচটায় আমাদের ডাক দিয়ে যায় কাজল। আমরা মানে আমি রাজা, পার্থ, পিন্টু, নাড়ু আর দিনু পাঁচজন প্র্যাকটিশে যাই ভাস্করদার কাছে, ঠিক পাঁচটা তিরিশ রিপোর্টিং টাইম না হলে পাঁচ রাউন্ড পুরো ফুটবল গ্রাউন্ড চক্কর। তবে কাজল আসে সাড়ে ছটায়। ভাস্করদা ওর জন্য এই ব্যবস্থা করেছে, না করে উপায় কি কারণ কাজল সেই ভোররাতে উঠে বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে একশো পেপার নিয়ে বাড়ি বাড়ি বিলি করে তারপর আসে মাঠে। বিধবা মা আর ফুটবল এই নিয়ে ওর ভালোলাগার জগৎ। ও ফুটবল খেলে মনপ্রাণ দিয়ে, যেমন গতি তেমনি দুই পা সমান চলে। তাছাড়া ওর ফুটবল সেন্সটাও খুব পরিষ্কার। এই কাজল ভাস্করদার আবিষ্কার। লম্বা কালো ছিপছিপে ছেলেটা রোজ প্র্যাক্টিস দেখতে আসতো, মনযোগ সহকারে খেলা দেখত, মাঝে মাঝে প্লেয়ার কম পড়লে খেলতো। ভাস্করদার চোখ জুহুরির চোখ। ঠিক চিনেছিল রত্নকে। কাজলের স্বপ্ন সে একজন বড় ফুটবলার হবে।

শোন, আজ প্র্যাক্টিস শেষ হলে তোরা পালাবি না, জরুরি কথা আছে ... ভাস্করদা কথাটা বলে জোরে হুইসেল বাজালেন, অর্থাৎ মাঠে চলো।

আমরা মুখে কিছু বললাম না, তবে সবার মনে একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, কি ব্যাপার?

নিয়ম মতো প্র্যাক্টিস সেরে মাঠের মধ্যেই বসে পড়লাম সকলে।

ভাস্করদা এলেন, সঙ্গে আমাদের ক্লাব নেতাজি স্পোর্টিং এর সেক্রেটারি বোস স্যার...

কোন ভূমিকা না করে ভাস্করদা বললেন – একটা সুখবর আছে তোদের জন্য, এ বছর মাহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র গোল্ড কাপ আন্ডার সিক্সটিন খেলা হবে আমাদের নেতাজি স্টেডিয়াম আর আর্মি ফুটবল গ্রাউন্ডে। তার চেয়ে বড় খবর এ বছর আমাদের ক্লাব সিলেক্ট হয়েছে এই টুর্নামেন্টে খেলার জন্য ...

বোস স্যার বললেন, তোমরা গতবছর লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলে বলে এটা সম্ভব হয়েছে ... এই টুর্নামেন্টে তোমরা তোমাদের সেরাটা দিয়ে খেলবে, হার-জিত নিয়ে ভাববার দরকার নেই, ওকে।

আমরা সমবেত ভাবে বললাম ... ইয়েস স্যার।

আট আট করে দুই গ্রুপে মোট ষোলটি দল খেলবে, প্রত্যেক গ্রুপের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে থাকা দুটি দল সেমিফাইনাল খেলবে। এবার বাংলাদেশ ও নেপালের দুটি দল দুই গ্রুপে খেলবে, আমাদের গ্রুপে আছে নেপালের দল।

পাঁচ ছয় ঘণ্টা ধরে জোর প্র্যাকটিস চলছে, ভাস্করদা প্রত্যেকের দিকে নজর রাখছেন

এবং ভুল ত্রুটি শুধরে দিচ্ছেন। ওনার একটাই মন্ত্র – বিপক্ষের ক্ষমতা নিয়ে না ভেবে নিজেদের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস রাখা আর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হার না মানা মানসিকতা নিয়ে খেলতে নামা।

যতদিন এই টুর্নামেন্ট চলবে ততদিন কাজলের পেপার দেওয়া বন্ধ। ক্লাব ওর এবং ওর মায়ের খরচ বহন করবে। প্রথমে ও রাজি হচ্ছিল না। সকলে মিলে বলতে মানলো।

নেতা-মন্ত্রী, বিশিষ্ট জন ও ফুটবল সংস্থার কর্তাদের উপস্থিতিতে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গোল্ড কাপের খেলা শুরু হল। প্রথম দিন আমাদের খেলা মুর্শিদাবাদের ইলেভেন স্টার-এর সঙ্গে। আমরা সকলেই ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত। যতদূর জেনেছি ওদের ডিফেন্স খুব ভাল। ভাস্করদা আমাদের বলে দিয়েছেন তাড়াহুড়ো না করে ধীরে খেলা শুরু করে ওদের একটু বুঝে নিয়ে দ্রুত আক্রমণে যেতে।

খেলা শুরু হতেই বুঝলাম, সত্যিই ডিফেন্স ছাড়া বাকি সব বিভাগ কমজোর। কাউন্টার অ্যাটাকে ঝড় তুলে আধ ডজন গোলে ম্যাচ জিতলাম। দর্শক, সমর্থক এবং ফুটবল কর্তা সকলেই আমাদের খেলা দেখে খুশি, শুধু ভাস্করদার কপালে ভাঁজ। এত বড় জয় আমাদের আত্মতুষ্ট না করে।

প্লেয়ার লিস্টে কাজল, পার্থ সহ চারজনের নাম না থাকায় প্রথমে আমরা আশ্চর্য হয়েছিলাম, কিন্তু এখন বুঝলাম ভাস্করদা একবারে গ্রুপের সামনে সব তুরুপের তাস খেলতে চাইছেন না।

আমরা গ্রুপের সবকটি ম্যাচ প্রাধান্য নিয়ে জিতে টপে, শুধু নেপালের সাগরমাথা ইলেভেন্স এর সাথে খেলায় আমাদের গোলকিপার শ্যামলকে বুকে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হল। তবে আঘাত তেমন গুরুতর নয় এটাই রক্ষা।

সেমিফাইনালে আমাদের সামনে গ্রুপ বি-র রানার্স বঙ্গবন্ধু একাদশ, বাংলাদেশের দল। ভাস্করদা আমাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে বুঝিয়ে দিলেন কার কি দায়িত্ব। সঙ্গে এটাও বোঝালেন এটা একটা টিম গেম।

সেমিফাইনাল খেলার দিন মহা বিপত্তি। আমাদের অন্যতম প্লেয়ার পিন্টু হঠাৎ প্রচণ্ড বমি পায়খানা করে দুর্বল হয়ে মাঠে নামার মতো অবস্থায় নেই। ভাস্করদা আমাকে আর পার্থকে দুই উইং থেকে খেলা তৈরির ও বল সাপ্লাই করার দায়িত্ব দিলেন। কাজলের যেহেতু দুই পা সমান চলে ওকে আর লম্বু সনাতন মাঝিকে মাঝখান থেকে বিপক্ষের গোলে হামলা করার দায়িত্ব দিলেন। বাংলাদেশের টিম যে রীতিমতো হোমওয়ার্ক করে এসেছে তা খেলা শুরু হতেই বোঝা গেল ম্যান টু ম্যান মার্কিং ও হঠাৎ গতি বাড়িয়ে আক্রমণ করা থেকে। আমাদের আক্রমণ বিপক্ষের বক্সের বাইরে আটকে যাচ্ছে। ওরা দু দু'বার আমাদের বক্সের ভিতর ঢুকে পড়েছিল, একটা সহজ সুযোগ নষ্ট করেছে।

প্রথমার্ধ গোলশূন্য, বিরতির সময় ভাস্করদা বোঝালেন আমাদের কোথায় ভুল হচ্ছে আমরা একটু বেশি রক্ষণাত্মক হওয়ার ফলে ওরা চেপে বসেছে। বিরতির পর খেলা শুরু হতেই আমরা আক্রমণের ঝড় তুলে বার বার বিপক্ষের বক্সের ভিতর ঢুকতেই ওরা খেই হারিয়ে ফেললো। দশ মিনিটের মাথায় বক্সের বাইরে থেকে আমার নেওয়া ফ্রি কিকে নিখুঁত হেডে গোল করে দিলো কাজল। বাহান্ন মিনিটে নিজেদের মধ্যে সাতটা পাস খেলে পার্থ যে ফাইনাল পাসটা বাড়ালো তাতে সনাতনের গোল না করে উপায় ছিল না। অতিরিক্ত সময়ের বিরানব্বই মিনিটে কাজল একক প্রচেষ্টায় দুরন্ত ড্রিবলিং-এ চারজনকে নাস্তানাবুদ করে গোল করে গেল। এই নিয়ে টুর্নামেন্টে কাজলের দশটা গোল হয়ে গেল। তিন গোলে জিতে আমরা পৌঁছে গেলাম স্বপ্নের ফাইনালে। আমাদের খেলা শেষের আধ ঘণ্টা পরে আর্মি ফুটবল গ্রাউন্ড থেকে খবর এল দ্বিতীয় সেমিফাইনালে গ্রুপ বি'র বাঘাযতীন স্পোর্টিং এক গোলে দার্জিলিং ব্লুসকে হারিয়ে আমাদের মুখোমুখি।

ফাইনালের দিন চারিদিকে সাজ সাজ রব। বড় বড় ব্যানার লাগানো হয়েছে, লাউড স্পিকারে প্রচার চলছে। আমাদের সকলের মধ্যেই চাপা উত্তেজনা কাজ করছে কিন্তু কেউ প্রকাশ করছে না। ভাস্করদা ঠিক বুঝতে পারছে ব্যাপারটা, তাই আমাদের আজ হাল্কা অনুশীলন করিয়ে ছেড়ে দিয়ে বলেছেন, হার-জিত নিয়ে ভাবিস না শুধু ফুটবল খেলাটাও যে একটা শিল্প, একটা আর্ট সেটা প্রমাণ করা চেষ্টা করিস। খেলা শুরু হওয়ার দিন থেকে ক্লাব টেন্ট আমাদের ঠিকানা। কাজল ভাস্করদাকে বলে রেখেছিল ফাইনালে উঠলে ওকে পারমিশন দিতে হবে মা'র সাথে দেখা করে আশীর্বাদ নিয়ে আসার। ভাস্করদার মোটেই ইচ্ছে ছিল না ওকে ছাড়ার, কিন্তু কথা দিয়েছেন বলে ছাড়লেন তবে এক ঘণ্টার জন্য। আশ্চর্য ছেলে এই কাজল। এতটুকু উত্তেজনার ছাপ নেই ওর চোখে মুখে। কেমন আনন্দে সাইকেলের বেল বাজাতে বাজাতে চলে গেল মা'র সাথে দেখা করতে, কাজলের কাছে ওর মা সম্পূর্ণ জগৎ। ভাস্করদা হন্ত দন্ত হয়ে আমাদের রুমে ঢুকে জানতে চাইলেন কাজল ফিরেছে কিনা। তাইতো, আমরা খেয়াল করিনি দু'ঘণ্টা হতে চললো কাজল তো এখনও ফেরেনি, কি ব্যাপার - সকলের মনে এক প্রশ্ন।

পানুকাকা, এই ক্লাবের মালি, ছুটে এসে ভাস্করদাকে বললো - দাদাবাবু বোস স্যার তোমারে ডাকতিছেন তাড়াতাড়ি।

হঠাৎ এমন আর্জেন্ট কল?

কার একজনের নাকি দুর্ঘটনা হইছে শুনলাম।

আমরা সমস্বরে বললাম, দুর্ঘটনা মানে এক্সিডেন্ট, কার?

একটু পরে জানতে পারলাম এই দুর্ঘটনা আর কারো নয় হয়েছে কাজলের। মা'র সঙ্গে দেখা করে হাই স্কুল মোড়ে রং সাইড থেকে জোরে ছুটে আসা বাইক ধাক্কা মারে।

ও সাইকেল সহ মাঝ রাস্তায় ছিটকে পড়ে। আশপাশের লোকেরা তুলে হাসপাতালে নিয়ে যায়, ভাগ্য ভাল তেমন মেজর কিছু হয় নি তবে কপালে তিনটে স্টিচ পড়েছে, বাঁ গাল ছুলে গেছে আর বাঁ হাতে সামান্য চোট পেয়েছে। ডাক্তার ওকে বিশ্রাম করতে বলেছিলো কিন্তু ও জোর করে ক্লাবে চলে এসেছে। ভাস্করদার সাথে ওর সাফ কথা, টিম ফাইনালে খেলবে আর ও বেডে শুয়ে থাকবে এ হতে পারে না। ওর সাহস আর জেদ দেখে ভাস্করদাও কিছু বলতে পারে নি।

কাজলের এই ঘটনা আর ওর না খেলতে পারাটা আমাদের মনোবলকে নাড়া দিয়ে গেছে, এটা ভাস্করদা যতটা অনুমান করেছেন মনে হয় কাজল তার চেয়ে বেশি অনুভব করেছে তাই খেলা শুরুর আগে প্লেয়ার্স মিটিংয়ে কাজল ক্লাব কর্তাদের ও ভাস্করদাকে বললো আপনারা দয়া করে আজেকর ফাইনাল টিম থেকে আমার নামটা কেটে দেবেন না, আমি প্রয়োজনে মাঠে নামবো আমার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়বো। অনেক আলোচনার পর ভাস্করদার পরামর্শে কাজলকে আঠারো জনের দলে রাখা হল।

নির্ধারিত সময়ে খেলা শুরু হল। তার আগে দুই দলের খেলোয়াড়দের সাথে রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী ও ফুটবল সংস্থার কর্তাদের পরিচয় ও শুভেচ্ছা বিনিময় পর্বে মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা কাজলও আমাদের সাথে থাকলো। খেলা চলছে। দু'দলই অতিরিক্ত রক্ষণাত্মক হওয়ার ফলে খেলার মান খুব খারাপ। দর্শক আমাদের হয়ে গলা ফাটাচ্ছে কিন্তু তাতে লাভ হচ্ছে না। আমাদের খেলায় বার বার ছন্দ কেটে যাচ্ছে। প্রচুর মিস পাস, উদ্দেশ্যহীন দৌড় সর্বোপরি সনাতন আর পার্থর অফ ফর্ম। বিপক্ষের অবস্থাও তথৈবচ। গোলহীন ম্যাড়ম্যাড়ে প্রথমার্ধ শেষ হল।

ভাস্করদার তো শান্ত কোচের মুখ থমথমে .... তোরা কি কাজলকে নিয়ে ভেবে খেলা ভুলে গেলি না ওর না থাকাটা তোদের কনফিডেন্স কেড়ে নিয়েছে? তোরা কি চাইছিস কাজলকে নামিয়ে দি? ওর মনের জোর কত তা তোরা ভাল করে জানিস। আমি বলা মাত্র ও কোনো প্রশ্ন না করে এই শরীরে মাঠে নেমে পড়বে...

আমি রেডি দাদা, কাজল কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে আমরা খেয়াল করিনি।

না... ভাস্করদা কঠিন গলায় বললেন। এটা ওদের প্রমাণ করার লড়াই ওরা তোকে কতটা ভালবাসে। আর এই যে পার্থবাবু, সনাতনবাবু - তোমাদের হয়েছেটা কি? হোয়াই সো নার্ভাস, কি হয়েছে কেন সহজ খেলা খেলতে পারছিস না? নিজেকে নিজে প্রশ্ন কর উত্তর খোঁজ....

দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের খেলা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এল। সনাতন ও পার্থ আস্তে আস্তে খেলায় ফিরছে। তার ফল হাতেনাতে পাওয়া গেল বাহান্ন মিনিটের মাথায় দুরুহ কোণ থেকে দুরন্ত শটে গোল করে ফেলল পার্থ, যেন শাপমুক্তি হল ওর। খেলা মোটামুটি আমাদের আয়ত্তে যে কোন সময়ে আবার গোল পাব হঠাৎ ঘটে গেল ঘটনাটা।

বিপক্ষ একটা কর্ণার পেয়ে আপাত নিরীহ একটা শট করেছে গোলমুখে। সেটা আটকাতে গিয়ে আমাদের ডিফেন্ডার শিবেনের হাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে বলটা লাগতেই রেফারি পেনাল্টি দিয়ে দিল, আমাদের কোনো কথাই শুনলো না। খেলা ক্রমে শেষের দিকে এগুচ্ছে, এই বুঝে ড্র হয়ে অতিরিক্ত সময়ের দিকে যাচ্ছে। দশ মিনিট খেলা বাকি, এছাড়া কয়েক মিনিট অ্যাডেড টাইম হবে।

ভাস্করদা চেঞ্জ চাইলেন এবং আমাদের সকলকে এমনকি বিপক্ষকে চমকে দিয়ে সনাতনকে তুলে মাঠে পাঠালেন মাথায় ব্যান্ডেজ করা কাজলকে। কে বলবে ও আহত। বল পায়ে আসতেই গতিতে নিখুঁত পায়ের কাজে বিপক্ষের ডিফেন্সকে নাচাতে লাগল। অ্যাডেড টাইম নিয়ে আর ছয় মিনিট খেলা বাকি। আমরা একের পর এক আক্রমণ শানাচ্ছি কিন্তু গোল হচ্ছে না। টিক টিক করে সময় এগোচ্ছে, আমি আর পার্থ নিজেদের মধ্যে বল দেওয়া নেওয়া করতে করতে বাঁ দিক দিয়ে উঠে কাট করে বিপক্ষের বক্সের মধ্যে ঢুকছি হঠাৎ দেখি কাজল ডানদিক দিয়ে বিড়ালের মত নিঃশব্দে বক্সে ঢুকে পড়েছে। আমার মন বললো ও বলছে বলটা বক্সের ভিতর তুলে দিতে, কেন জানিনা আমি মনের কথা রাখতে বলটা বক্সের ভিতর তুলে দিলাম। দুজনকে দেখলাম হেড করতে উঠছে আর ঐ দুই জনের মাঝখান দিয়ে চকিতে একটা শরীর শূন্যে ভেসে উঠলো আর পলক ফেলতে না ফেলতে একটা পা আছড়ে পড়লো বলের গায়ে... কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা, তারপর পুরো মাঠ চিৎকার করে উঠলো... গো...ও...ল। আমরা ছুটে গেলাম গোলদাতার কাছে, ততক্ষণে গোলদাতা কাজল উঠে দাঁড়িয়েছে। আমরা সকলে ওকে জাড়িয়ে ধরলাম। ওর মুখে অনাবিল হাসি আর চোখে পরম তৃপ্তি। কাজল আমার হাতদুটো ধরে বললো আমি মনে মনে চাইছিলাম তুই বলটা ঠিক এইভাবে বক্সে ফেল। আমি ওকে মাঝখানে থামিয়ে বললাম আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানিস আমার বার বার মনে হচ্ছিল তুই ঐখানে বলটা চাইছিস ... বন্ধুরা সমস্বরে বললো এর নাম টেলিপ্যাথি। কাজল বললো ঐ ভাবে বলটা আসতেই ঠিক করলাম বলটাকে মাটি ছুঁতে দেওয়া যাবে না, যা করার আগেই করতে হবে। ব্যাস ওদের দুই ডিফেন্ডারের মাঝখান দিয়ে জাম্প করে ব্যাকভলিটা করলাম, বেচারা গোলকিপার কিছু বুঝতেই পারলো না। এতক্ষণে খেয়াল করলাম ওর ব্যান্ডেজটা অনেকটা লাল, স্টিচের জায়গা থেকে রক্ত বেরিয়েছে মনে হচ্ছে। ওকে বলতেই বললো চেপে যা আর কয়েক মিনিট। চল খেলাটা শেষ করি।

খেলা শেষ। আমরা জিতে গেছি। ভাস্করদার মতো কঠিন কোচ আবেগ সামলাতে পারলেন না। ছুটে এসে কাজলকে জড়িয়ে ধরলেন। কাজলের কপাল বেয়ে নামা রক্ত আর চোখের জল মিলেমিশে একাকার হয়ে আনন্দ অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ছে। এ যে শুধু একটা জয় নয়, এ যে স্বপ্ন পূরণের গল্প।।

স্মৃতির তর্পণ ■ জেবুননেসা হেলেন

ছাদে ছাদে সেকালে অনেক কোলাহল। বল বউচি আর ক্রিকেট খেলার মিনারেল ধুম। বিকেল মেলানো সন্ধ্যা অস্তরাগে। চিমনির আলো কাঁচঘষা প্রদীপ জ্বলতো তখন এক দুই তিন ...

ক' ঘর বসতি! কত আর হবে? গোটা তিন চার। এখন সেখানে সহস্রজনের বাসা বাড়িঘর।

ঘুমভাঙা ভোর, পাখির কাকলি! শিউলি বকুল ফুলের মালা, যা যেমন ইচ্ছে গড়ত দু'বেলা। আলভোলা মন মাঠে আর বনে ছুটতো যেমন যখন খুশি। বাসিফুল শুঁকে নাকের ডগায় মাখতো রেণু রূপসী। ঘুড়ি আর নাটাই সব ঘরে ছিলো। বড় ছোট নেই, সবাই একসুতোয় বোণা তাঁতের মতই। রঙতুলিহীন ক্যানভাস যেন আমাদের সে পাড়া – গড়া হতো গুরুভক্তির মাথানত করা।

আমি আর সে সই যদি হই। তার ভাই আর আমার ভাই, ভাই-ভাই নয়! বন্ধুও হতো। কত কত কথার রূপকথা।

আর ছিলো কদমফুলের কেশর দিয়ে ভাত পোলাও আর প্যাপরোমিয়ার রেণুর ছালুন! আর নয় আজ। এটুকুই থাক। আর কোনো দিন টিলোএক্সপ্রেস অথবা ঘুড়ি উৎসব অথবা মাছের পোনায় জোলাভাতি হবে। তবু জেনো, কত কথা রবে বাকি; সাকি আজ আমি থাকি, তুমি থাকো আসরের কলম। মুখবন্ধে একক সানাই। আমার রাধের একজন কানাই...



আমরা চোরের দল

কারখানার আম চুরি ■ কার্তিক পাত্র

তিন মাথা রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড বট গাছ। তার পর বেশ খানিকটা সমতল জমি। ওটাই আমাদের বর্তমানে খেলার স্থায়ী ঠিকানা। আমি, ঘোঁতা, ট্যাম্পা, গুজা বটের ছায়ায় গুলি খেলছি। ভজাদা আর ঘণ্টা এসে হাজির। ভজাদা আমাদের থেকে বয়সে বড়। তিনি আমাদের দলের ক্যাপ্টেন। আমরা সবাই তার কথা মানি। ভজাদাকে দেখেই ঘোঁতা জিজ্ঞাসা করল – গুলি এনেছো নাকি আমি গুলি দেব।

আজ গুলি খেলব না। একটা কথা বলতে এলাম। ভজাদা বলল।

কি কথা? গুজা জিজ্ঞাসা করল।

খুবই জরুরি কথা। সবাই আমার কাছে আয়।

বলা মাত্রই সবাই চলে এলাম ভজাদার কাছে। এসেই ট্যাম্পা বলল – এবার বল।

ভজাদা বলল – আমাদের পাশের গ্রামের কারখানাটা চিনিস?

আমি উত্তর দিলাম – চিনি। ওই শিমুল তলার বাঁধের ধারে।

ঘণ্টা বলল – ঠিক বলেছিস।

ভজাদা বলল – ওই কারখানার পাঁচিলের চারপাশে আমের গাছ আছে। প্রচুর আম ফলেছে।

আমরা কি করব? ঘোঁতা জিজ্ঞাসা করল।

ভজাদা বলল – আজ রাতে আমরা আম গাছের ওপর অপারেশন চালাবো।

তারমানে আম চুরি। ট্যাম্পা বলল।

হ্যাঁ রাত ঠিক এগারোটার সময়। ঘণ্টা বলল।

ভজাদা বলল – সঠিক সময়ে সবাই এখানে চলে আসবি।

গুজা উত্তর দিল – ঠিক আছে।

ভজাদা আমাকে বলল – পুটাই তুই টর্চ নিয়ে আসবি।

আমি বললাম – বাবা যদি জানতে পারে খুব বকবে।

ঠিক আছে আনতে হবে না। শুক্ল পক্ষ আছে। চাঁদের আলোয় পথ ভালোই দেখা যাবে। এখন যাচ্ছি রাতে দেখা হবে। চলে আয় ঘণ্টা। ঘণ্টাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল ভজাদা।

আমরা আরো কিছুক্ষণ গুলি খেলে খুশি মনে বাড়ি ফিরলাম। রাত বাড়তেই বটতলায় সবাই হাজির। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শুরু হল পথ চলা। গ্রামের বসত বাড়ি পেরিয়ে মেঠোপথ ধরলাম। দুপাশে হোগলা গাছের ঝোপ। হোগলা গাছের ছায়ার জন্য চাঁদের আলো পর্যাপ্ত পড়ছে না। আলো আঁধারির খেলায় রাতের নিঝুমতা ক্রমশ প্রকট

হয়ে উঠছে। জঙ্গলের মধ্যে থেকে পাতা পচার উটকো গন্ধ ভেসে আসছে। দূরে শিয়াল ডাকছে। বেশ কিছুক্ষণ হেঁটে গা ছমছম জঙ্গল পেরিয়ে কারখানার পিছন দিকে এলাম।

ভজাদা কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে পরিস্থিতি বুঝল। তারপর আমাদের বুঝিয়ে দিল।

সমস্ত ব্যাপারটা বোঝার পর ঘণ্টা, গুজা, ঘোঁতা, আমি তরতর করে পাঁচিলে উঠে পড়লাম। ঘণ্টা আর গুজা পাঁচিলে দাঁড়িয়ে ডাল ধরে গাছে উঠে পড়ল। আমি আর ঘোঁতা পাঁচিলে দাঁড়িয়ে চারিদিকে নজর রাখছি। নিচে ভজাদা আর ট্যাম্পা দড়ির সাহায্যে নামানো আমের ব্যাগ খালি করে বস্তায় ভরছে। প্রায় হঠাৎ ঘটল বিপর্যয়। কারখানায় একটা গাড়ি ঢোকায় আলো পড়ল আমাদের ওপর। গার্ডম্যান আমাদের দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল – কৌন হ্যায়।

শব্দ শোনা মাত্রই দ্রুত গাছ থেকে নেমে এল দুজনে। চারজনে পাঁচিল থেকে লাফ দিলাম একসাথে। ভজাদা আর ট্যাম্পা বস্তা দুটো কাঁধে তুলে নিয়েছে। কারখানার ভিতর চারিদিকে হুইসেল বাজছে। ভজাদা বলল – আমাদের অন্য পথ ধরতে হবে।

পশ্চিমের মরা খালটায় হাঁটু খানেক জল হবে। আমরা পেরিয়ে যেতে পারব। ওরা শীতকালে জলে নামবে না। খাল পেরিয়ে মুকুন্দপুরের ওপর দিয়ে চলে যাব।

সেই রাতে মুকুন্দপুরের মাঠের ওপর দিয়ে দৌড় দিয়ে কোনো রকমে মার খাওয়ার হাত থেকে বেঁচে ফিরলাম।

পরদিন ভাগ পেয়ে সকলে খুব মজা পেলাম।

রাজার আবিষ্কার ■ রাজা দেবরায়

দুই বন্ধু ভজা এবং রাজার বহুদিন পরে দেখা। রাজা একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। রাজা সবসময়ই নিত্যনতুন গবেষণা, আবিষ্কার নিয়ে ব্যস্ত থাকে। প্রতিবারই দুই বন্ধুর কথাবার্তা বেশ জমজমাট হয়।

ভজা ঃ আরে রাজা দেখি! অনেকদিন পরে দেখা হলো। কেমন আছিস, এগুলো বলে তোকে লাভ নেই! বরঞ্চ এটা বল্, আজকাল কী গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত তুই?

রাজা ঃ তুই তো জানিসই আমি সবসময়ই গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। এই তো দোলের আগে একটা নতুন রঙ সৃষ্টি করলাম। এখন আবার আরো কিছু গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত আছি। অনেকদিন ল্যাব থেকে বরেুইনি। তাই একটু হাওয়া খেতে বেরোলাম। ভালোই লাগলো তোর সাথে অনেকদিন বাদে দেখা হলো।

ভজা ঃ তা অনেকদিন ল্যাবে ছিলি মানে তো দিনরাত কাজ। খাওয়া, ঘুম, স্নান নেই। আর তোর অনেকদিন মানে তো কমপক্ষে ছয় মাস! ও হে মনে পড়লো, গতবার তোর সাথে যখন দেখা হয়েছিলো, তুই বলেছিলি তুই দুটো জিনিস আবিষ্কার করেছিলিস। একটা হলো ওষুধের মতো আর একটা স্প্রে।

রাজা ঃ বাহ্ তোর মনে আছে?

ভজা ঃ একদম মনে আছে। ওষুধের মতো যেটা, সেটা একটা ট্যাবলেট। একটা খেলে একমাস খাওয়া আর ঘুমের দরকার হয় না, মানে এগুলোর অনুভূতিই হয় না। আর সারা শরীরে একবার স্প্রে করলে দুই মাস স্নান করতে হয় না, তাছাড়া শরীর থেকে খুব সুন্দর গন্ধও বেরোয়!

রাজা ঃ আরিব্বাস! সাবাস! সবগুলো কথা মনে রেখেছিস দেখছি। হ্যাঁ, এই ট্যাবলেট বানাতে বেশ কয়েক বছর সময় লেগেছে আমার। বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে ট্যাবলেট তৈরি করেছি। এছাড়া বিভিন্ন ভিটামিন, মিনারেলস ইত্যাদির উপর গবেষণা করে এই ট্যাবলেট বানাতে সক্ষম হয়েছি। প্রথমে ভেবেছিলাম খাওয়া এবং স্নানের জন্য আলাদা আলাদা ট্যাবলেট বানাবো। কিন্তু পরে কী মনে হলো, একটা ট্যাবলেট খেলেই যেন দুটো কাজ একসাথে হয়ে যায়, সেই কথা মাথায় রেখে এক ট্যাবলেটেই দুটো বিষয় রাখা হয়েছে। তবে তুই যে এই কথাটা মনে রেখেছিস তার জন্য আবারো তোকে সাবাশি জানাই বন্ধু।

ভজা ঃ যাব্বাবা, এতে সাবাশির কী আছে! তোকে বরঞ্চ সেরা থেকে অনেক কিছু বললেও কম বলা হবে। তুই সত্যিই পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী!

রাজা ঃ আরে না না, কী যে বলিস! তুই বন্ধু বলেই একটু বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে গেছিস!

ভজা ঃ আচ্ছা এখন বল্, দোলের আগে নতুন রঙ সৃষ্টির ব্যাপারটা।

রাজা ঃ আরে ভাই ওটা এমন কিছু নয়। দোলে তো সবাই অনেক রঙ মাখে। তবে সবগুলো মাখায় যাকে দেওয়া হয়েছে তার চেহারা প্রায় কালো হয়ে যায় বা বলা ভালো 'ভূত' বানিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া অল্প রঙ দিলেও সবাইকে তো আর সব রঙ মানায় না। তাই আমি এমন রঙ বানিয়েছি, যেটা দেখতে কালো হলেও যার গালে বা শরীরে দেওয়া হবে তার গায়ের রঙের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি অতি সুন্দর রঙ সৃষ্টি হবে। আবার সেটা দেখতে যেমন ভলো লাগবে তেমনি গন্ধও বেশ ভালো হবে। ফলে যাকে লাগানো হবে তার চেহারা খুবই সুন্দর দেখাবে।

ভজা ঃ দারুণ ভাই দারুণ! তোকে যে কী বলে প্রশংসা করবো সেই শব্দই খুঁজে পাচ্ছি না। আচ্ছা এখন তাহলে কী বিষয় নিয়ে গবেষণা করছিস?

রাজা ঃ সারপ্রাইজ! সারপ্রাইজ! সারপ্রাইজ! আগে হোক তারপরে না হয় আবার এরকমভাবে দেখা হলে জানতে পারবি। আচ্ছা বন্ধু আবার পরে কথা হবে।

ভজা ঃ সেই ভালো। আমারও কয়েকটা মাস উত্তেজনার মধ্যে কেটে যাবে। তোকে আর আটকাবো না। ভালো থাকিস, শরীরের প্রতি যত্ন নিস। চল্ টা-টা।

রাজা ঃ তুইও ভালো থাকিস বন্ধু। টা-টা।

ভাষার গন্ধ ■ অনুপকুমার আচার্য

কলকাতা থেকে বাসে ঢাকা যাওয়া যাবে – খবরের কাগজে পড়ে বাবা 'হুররে' বলে লাফিয়ে উঠলেন। তারপর সাত তাড়াতাড়ি পাসপোর্ট করে ফেললেন – কারও ইচ্ছের তোয়াক্কা না করেই। ক্যালেন্ডারে চোখ রেখে পুজোর ছুটির হিসেব করে বললেন – একদিন ছুটি নিলেই আটদিনের কেল্লা ফতে! এ সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না।

অগত্যা বাবার হুড়োহুড়িতেই কলকাতার পুজো ছেড়ে মহাসপ্তমীর সাতসকালে ঢাকার বাসের জন্যে ছুটতে হল।

বাসে উঠতে অনেকক্ষণ মন খারাপ যায়নি তুন্তাইয়ের। বাবার সঙ্গে এর আগে দার্জিলিং কিংবা পুরী গেলেও পুজোর সময় কলকাতা ছাড়া এই প্রথম। পুজোর কলকাতা ছেড়ে কেউ কোথাও যায়?

তবু, বাস দু'দেশেরে সীমানা পেরিয়ে এদেশে ঢোকার সময় টানটান উত্তেজনায় সে চোখ মেলে বসেছিল বাসের জানলায়। বিদেশ ভ্রমণ বলে কথা! দোকানপাটের সাইনবোর্ড পড়তে পড়তে পেরিয়ে যাচ্ছে সাতক্ষীরা যশোর খুলনা মাগুড়া নড়াইল ফরিদপুর – এইসব জায়গা। উৎসাহে ফুটতে ফুটতে দু'একটা কথা বাবাকে জিজ্ঞেস করছিল মাঝে মাঝে। হুঁ হাঁ করে দায়সারা উত্তর দিচ্ছিলেন বাবা। তুন্তাইয়ের কৌতুহল তাতে মিটছে না। বরং আহত বোধ করছিল বাবার নির্লিপ্ত আচরণে। উদাসীন চোখমুখের চেহারায়।

কমলাপুর রেল স্টেশনকে পেছনে ফেলে বাসটা এগোতেই তুন্তাই জানলার কাচ দিয়ে রাস্তায় পোঁতা ঢালাই করা ফলকে জায়গার নাম দেখল – নারায়ণগঞ্জ। দু'কদম পরে 'বন্দর' থানার দিকে যাবার তির চিহ্ন আঁকা পথ নির্দেশ। হোটেল 'সোনার গাঁও'য়ের ঝলমলে চেহারা জ্ঞান হওয়া থেকে অজস্রবার শোনা নামগুলো চোখে পড়তেই তুন্তাই আনন্দে সব কিছু ভুলে সামনের সীটে বসে থাকা বাবাকে ডাকল – বাবা! বাবা!

দু'বার ডেকেই হুঁশ ফিরল তার। বাবা সদ্য বাসে ওঠা পাশের সহযাত্রীর সঙ্গে কথায় মশগুল হয়ে গেছেন এরই মধ্যে।

ঈষৎ দমে গেল তুন্তাই। এমন সোৎসাহ ডাকে সাড়া না দেবার মতো মানুষ নন। কিন্তু এ দেশের মাটিতে পা দেওয়া থেকে বাবা যেন অন্য মানুষ। এমনিতে কথা বলতে ভালবাসেন দারুণ। মজার কথা। প্রায় সবার সঙ্গে। যেন কথার তুবড়ি!

কিন্তু এখন সেই মানুষকে কে চিনবে! কথা বলছেন কম। মুখে হাসি নেই। যেন মা কিংবা সে অন্য কারও সঙ্গে এদেশে বেড়াতে এসেছে!

অথচ বাড়িতে এ দেশের কত গল্প! জল-মাটি গ্রামগঞ্জ খালবিল নদ-নদী ডিঙি নৌকো ফল-পাকুড়। মানুষজন তো আছেই! জন্মভূমি বলে কথা! শুধু কি তাই। স্কুলের

শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত কাটিয়েছেন এ দেশেই। এ দেশের কথা উঠলে যেন শেষ হতেই চায় না।

আসলে বাবার চোখেই এ সব দেখা তার। সব চেনা। নয়তো তার কি। বাপ-ঠাকুর্দার দেশ ছাড়া কিছু নয়। তাও কোন কালের! তার জন্মের আগেকার কথা সব। মা-রও এক অবস্থা। শুধু মা কেন, মামাবাড়ির সবাই তো খাস কলকাতার মানুষ!

পদ্মার ফেরিতে বাস ওঠার সময় কি একটা কথায় বাবা চোখ পাকিয়ে থামিয়ে দিলেন তাকে। অবাক হয়েছিল সে। অভিমানও।

সত্যি বলতে কী, চেনা মানুষকে অচেনা মনে হচ্ছিল রীতিমতো।

সামনের আসনে বাবা দিব্যি খোশ গল্পে মজে আছেন সহযাত্রীর সঙ্গে। মানুষজনের কথাবার্তায় কিছুই কানে আসছে না। মা-র সঙ্গে পেছনের আসনে বসেও। সিটগুলো নিচু বলে দেখাও যাচ্ছেনা দু'জনকে।

বিদেশ বিভুঁইয়ে কী এত কথা অচেনা মানুষের সঙ্গে! হঠাৎই কৌতুহলে মাথা তুলল ফের। নিজেও দাঁড়িয়ে পড়ল আসন ছেড়ে।

বাপ্‌রে! বাবার সহযাত্রী ভদ্রলোককে দেখে তুন্তাইয়ের চোখ ছাড়াবড়া! এমন বিশাল চেহারার মানুষও হয় নাকি! প্যান্টশার্টের ওপর মাথায় টুপি। চিবুকে ছুঁচলো দাড়ি। ধবধবে ফর্সা গায়ের রঙ। বাবাকে নেহাতই ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে তার পাশে।

ভদ্রলোক বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন – যাইব্যাক কদ্দূর? (যাবেন কতদূর?)

– চাটগাঁ পইযন্ত! (চাটগাঁ পর্যন্ত!) বাবা উত্তর দিলেন। – অনে থাকন কন্ডে? (আপনি থাকেন কোথায়?) পাল্টা জিজ্ঞাসা বাবার।

তুন্তাইয়ের কানে লাগল কথাটা। তবু রা কাড়ল না মুখে।

– চাটগাঁর কন জাগা? (চাটগাঁর কোন্ জায়গায়?) ফের জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক। বাবার প্রশ্নকে আমল না দিয়ে।

– কানুনগো পাড়া চিন্‌ন? (কানুনগো পাড়া চেনেন?) জবাবে ফের পাল্টা প্রশ্ন বাবার।

তুন্তাইয়ের এবার অবাক হবার পালা। এ কোন্ ভাষা বাবার মুখে! জীবনেও শোনে নি। ভাষা কেন, ভঙ্গিও। কিছুটা নাকিও শোনাচ্ছে গলার স্বর।

– বুঝজি! বুঝজি! (বুঝেছি! বুঝেছি!) ফের প্রশ্ন ভদ্রলোকের – তা কইলকাতার থন্ কন্ আইসন? (তা কলকাতা থেকে কবে এসেছেন?)

– কালুয়া আসসি। এন্ডে বোইনের বাড়ি আছে। অন্ বাড়ি যাইস্। ইচ্ছা আছে, কক্সবাজার যনর্। (কাল এসেছি। এখানে বোনের বাড়ি আছে। এখন বাড়ি যাচ্ছি। ইচ্ছে আছে কক্সবাজার যাবার।)

মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার শব্দ তুন্তাইয়ের। এই ভাষা আর ভঙ্গি তার অচেনা। এই বাবাকেও চেনে না সে!

তবু, এই ভাষাও বাংলাই! রূপ আলাদা হলেও। বিস্ময়ের থই নেই! একটু অন্যরকম গন্ধও কি টের পাওয়া যায় ভাষার শরীরে? মাটির গন্ধের মতো। তুন্তাই নাক টানল যেন।

ওদিকে কক্সবাজারের নাম শুনে ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠলেন – আসতক্! আসতক্! হেন্ডে হোটেল আছে আর। বাড়িও আছে। কখে আইব্যাক্ অনে? (আসুন! অসুন! সেখানে হোটেল আছে আমার। বাড়িও আছে। কবে অসছেন আপনি?) কথার মাঝখানে বুক পকেটের কাগজের স্তুপ খেরে একখানা কার্ড বার করে দিলেন বাবাকে।

– চাই কখে যাইত্ পারি। (দেখি কবে যেতে পারি।) কার্ড হাতে নিয়ে সযত্নে পকেটে রাখতে রাখতে বাবা বললেন – বাড়িত্ মানুষ অনেক। পাড়ার মানুষের হঙ্গেও দেহা করন্ পরিব। (বাড়িতে অনেক মানু। পাড়ার লোকজনের সঙ্গেও দেখা করতে হবে।) তারপর ফের দু'জন ডুবে গেলেন নিবিড় কথাবার্তায়। একই ভাবে।

ভাষার গন্ধ নয় শুধু। গন্ধের সীমানা পেরিয়ে ভাষার অনেক গল্পের রেশ টের পাচ্ছিল তুন্তাই। তার জন্মের আগের কথা হলেও, কিছুটা জানে সে। বাকিটা এবার জেনে নেবে ধীরেসুস্থে।

বাস থেকে নেমে রিকশার দিকে যেতে যেতে বাবা মা-কে বললেন – ভদ্রলোকের নাম কাসেন বক্স। ভারী ভাল মানুষ। অনেক কথা হল।

তুন্তাই বাবার দিকে তাকাল। তার চেনা বাবা। এতক্ষণের বিস্ময় মুছে চেনা খুশি ফিরে আসছে মনে।

বাবার পাশে হাঁটতে হাঁটতে তুন্তাই অচেনা এক গন্ধে ডুবে যেতে থাকল।



ইজ্জত গেল ■ অর্পিতা ঘোষ পালিত

গতকাল অনেকদিন পর আয়ুসদের বাড়িতে ওদের দিদুন বেড়াতে এসেছে, সাথে নিয়ে এসেছে দু-ভাইয়ের জন্য খেলনা। আয়ুস আর পীযুষ দিদুনকে পেয়ে আর খেলনা পেয়ে ভীষণ খুশি।

পীযুষ বড়, বয়স আট বছর, ক্লাস টু-তে পড়ে। ওর জন্য ছোট ক্রিকেট ব্যাট-বল আর আয়ুস মাত্র চার বছরের, নার্সারিতে পড়ে, ওর জন্য একটা সুন্দর গদা নিয়ে এসেছে দিদুন।

দু-ভাই নিজের নিজের খেলনা নিয়ে ব্যস্ত। কিছুক্ষণ খেলার পর অন্যজনের খেলনার প্রতি আকৃষ্ট, অথচ কেউ কারোর খেলনা অন্যকে দেবে না। পীযুষ নিজে ব্যাট ধরে সব সময় ভাইকে বল করতে বলছে, ব্যাট নৈব নৈব চ। আয়ুসও কম যায় না, গদা নিয়ে দাদাকে তাড়া করছে।

এমনিতে দু-ভাই অন্তরঙ্গ প্রাণ, কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। কোনো লোভনীয় চকোলেটও একে অপরকে না দিয়ে খায় না।

অনেক বলে, দিদুনের কাছে নালিশ করে ব্যাট হাতে পেয়েছে আয়ুস।

পীযুষ ভাইকে বললো – যতক্ষণ আউট না হবি ততক্ষণ ব্যাট করতে পারবি, আউট হলে আর ব্যাট পাবি না।

আয়ুস ব্যাট পেয়ে ভীষণ খুশি, দাদাকে বললো – আমাকে তুই আউট করতে পারবি না, এমন চার-ছয় মারবো, দেখে থ হয়ে যাবি।

মুখ গোমড়া করে পীযুষ বল করলো... প্রথম বলেই আউট।

পীযুষ হাততালি দিয়ে আউট-আউট বলে চেঁচিয়ে উঠলো।

আমার আর কোনো ইজ্জত থাকলো না, যাও বা ব্যাট হাতে পেলাম, একটা অন্তত চারও মারতে পারলাম না। এই বলে কাঁদো কাঁদো মুখে দাদার হাতে ব্যাট দিলো।

পীযুষ – তোর জন্য গদা-ই ঠিক আছে, ব্যাট ধরতেই জানিস না, আবার ক্রিকেট খেলার সখ। নে বল কর...

অগ্যতা আবার বল হাতে নিলো আয়ুস।

দেশে করোনার আবহের কারণে ছোটদের স্কুল বন্ধ। মোবাইলে অনলাইন ক্লাসেস চলছে। ওদের মা প্রজ্ঞার একটা মোবাইল বলে দুজনের একদিনে ক্লাস রাখেনি। দু-ভাই এক স্কুলে পড়ে ও স্কুলের টিচাররা দু-ভাইকে চেনে তাই আলাদা দিনে ক্লাস রাখতে সুবিধা হয়েছে। পীযুষ ক্লাস টু-তে পড়ে বলে আয়ুসের থেকে ওর পড়ার চাপ বেশি।

সকালের টিফিন করার পর আয়ুস দিদার কাছে বায়না করে নিজের মুখ সিঁদুর আর আলতা দিয়ে হনুমানের মতো করে নিলো। খালি গা, শুধু একটা ছোট্ট জাঙ্গিয়া পরে।

গদা নিয়ে পা টিপে পাশের ঘরে গেল, দ্যাখে দাদা পীযুষ চুপ করে মোবাইল নিয়ে বসে ঘাটাঘাটি করছে। এই সুযোগ... দু-পা তুলে দাদার ঘাড়ে বসে মাথায় গদা দিয়ে মেরে বলে – জয় বজরংবলী, আমাকে ব্যাট দিবি না?

পীযুষ তখন অনলাইনে ক্লাস করছে, অপর প্রান্তের টিচার সেটা দেখে হো-হো করে হেসে ওঠে, বলে – আয়ুস কি সেজেছো তুমি?

আয়ুস – প্রিয়ঙ্কা ম্যামের গলা না, আমায় কি করে দেখলো?

পীযুষ – গাধা, নাম আমার ঘাড় থেকে, আমি অনলাইন ক্লাস করছি...

আয়ুস গদা ফেলে তাড়াতাড়ি দাদার ঘাড় থেকে নেমে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে গিয়ে বলে – আমার ইজ্জত একদম চলে গেল, আমাকে প্রিয়ঙ্কা ম্যাম চাড্ডি পরে দেখে ফেলেছে হনুমান সাজা অবস্থায়। আয়ুস ইজ্জত গেল কথাটা স্কুলে সহপাঠী বন্ধুদের কাছে শিখেছে।

ওদের মা, দিদুন দুজনে একসাথে হেসে ওঠে। দেখে আয়ুসের কান্না আরও বাড়ে...



একটি কিশোরের গল্প ■ বিজলী শীল

রিভু, বয়স আট, ক্লাস থ্রিতে পড়ে। খুব চঞ্চল কিন্তু বেশ মেধাবী। বাড়িতে সবাই তাকে পলু বলে ডাকে। স্কুলে গরমের ছুটি পড়েছে অতএব মামার বাড়ি তাকে যেতেই হবে। পড়াশোনার ব্যাপারে তার বাবা মা তাকে বিশেষ কিছু একটা বলে না। সে তার পড়াশোনা ঠিকঠাক করে। তার বাবা শরদিন্দু রায় বলেন ছোটোদের সব ব্যাপারে চাপ দেওয়া ঠিক নয়, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে। রিভুর মাও এই কথা বলেন। তার মামার বাড়ি জামশেদপুরে। সেখানে দাদু দিদা আর দুই মামা থাকে। বড় মামা বিদেশে থাকে আর ছোটমামা কলেজে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। ছোট মামা বিদেশ যাবে না, স্কুলে পড়াবে। আর থাম্মি আর দাদাই থাকে মালদায় সাথে কাকু আর কাম্মি থাকে। সে বছরে দুবার বেড়াতে যায় এই দুই জায়গায়। খুব মজা আর আনন্দ পায় তবে সে সবথেকে ভালবাসে ছোট মামাকে। খুব সকালের ট্রেন ধরে সে বাবা মায়ের সাথে জামশেদপুর পৌঁছে গেল।

মামাবাড়ি পৌঁছে ছোটমামার খোঁজ করলো, দিদার কাছে জানল দুপুরে মামা ফিরবে কলেজ থেকে। দুপুরে মামা বাড়ি ফিরল চেঁচাতে চেঁচাতে – ‘‘আমার ছুটি হয়ে গেছে, আমার ছুটি হয়ে গেছে’’, তার দুহাত দুদিকে ছড়ানো, বনবন করে সে উঠানে ঘুরছে। তার মানে মামার কলেজে ছুটি পড়ে গেছে। পলু জিজ্ঞেস করলো, ‘‘মামা তোমার কলেজ ছুটি হয়ে গেল?’’ হ্যাঁ খোকাবাবু আমাল ছুতি হয়ে গেল।’’ এরকম আধো আধো কথা মামাকে সে কক্ষনও বলতে শোনে নি। বড় হয়ে সে জানতে পারে ওটা একটা সিনেমার কথা। খাওয়াদাওয়া সেরে পলু ছাদে গেল। খুব ছোটাছুটির শব্দে দাদুর ঘুম ভেঙে যায় পাছে তাই তার মা তাকে সাবধান করার জন্য সামান্য বকুনি দিল। পলুর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। মা তাকে বকে না খুব একটা। মন খারাপ করে সে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুপচাপ পাখিদের মন দিয়ে দেখছে এমন সময় সে শুনল, ‘‘কিরে তৃতীয় সুর ও ষষ্ঠ সুর কি করছিস?’’ পলু চমকে দেখে ছোটমামা বিজয়। তার বড় মামার নাম অনন্ত আর ছোট মামার নাম বিজয়। সে বড় হয়ে জেনেছিল অনন্তবিজয় শ্রীকৃষ্ণের শাঁখের নাম। মামার কথা শুনে মা খুব হাসছে দেখে পলু বলল ‘‘কি বললে মামা? তৃতীয় সুর আর ষষ্ঠ সুর? সেটা আবার কি?’’ ভাই আর দিদির হাসি দেখে পলু বিব্রত বোধ করছে দেখে মামা বলল, ‘‘তোর মা কি বলে গান গায়?’’ ‘‘কেন সা রে গা মা পা ধা নি সা’’, পলু বলল। ‘‘তাহলে তৃতীয় আর ষষ্ঠ স্বর কি বল’’। হাতের কর গুনে সে বলল গা আর ধা। মানে গাধা, খুব রেগে গিয়ে সে প্রায় কেঁদে ফেলে। মা তুমি বিজয়কে কিছু বললে নাতো, খুব খারাপ কাজ করল বিজয়’’। ততক্ষণে বিজয় সিঁড়ি দিয়ে ছুটে পালিয়েছে। মায়ের দিকে অভিমানি দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে চিলেকোঠার ঘরে চলে গেল। সে রেগে গেলে সবাইকে নাম ধরে ডাকে।

একটু পরে মামা ঘরে ঢুকল, তার হাতে একটা বই। আদর করে পলুকে বইটা দিয়ে বলল, ‘‘মন দিয়ে বইটা পড়। আমার অনের কাজ আছে সেগুলো করতে হবে। রাতে আমরা গল্প করব।’’ তাড়াতাড়ি পলু বইটা হাতে নিয়ে নামটা দেখে আনন্দে একটা লাফ দিল। ‘‘কিরে লাফালাফি করছিস কেন?’’ মামা জিজ্ঞেস করল। ছুটে গিয়ে মামাকে জড়িয়ে ধরে

বলল, ''দারুন''। বইটার নাম ''চাঁদের পাহাড়'', লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সে মায়ের কাছে গল্পটা শুনেছে। তাই বইটা হাতে পেয়ে আনন্দ সে চেপে রাখতে পারল না। পুরো বইটা শেষ করতে রাত এগারোটা বেজে গিয়েছিল। কেউ তাকে বারণ করে নি, কেবল তার দিদা তাকে দু'বার খাইয়ে এসেছে। সে রাতে সে স্বপ্ন দেখেছিল মামার সাথে আফ্রিকা গেছে, আল্ভারেজের সাথে দেখা হয়েছে, বুনিপকে সে দেখতে পায় নি, খুব ভয় পেয়ে সে মা ভেবে মামাকে জড়িয়ে ধরে ছিল, মামা জানত এরকমটা হবে। সেই থেকে সে নিয়মিত গল্পের বই পড়া শুরু করে।

সকালে ঘুম থেকে উঠতে একটু বেলা হয়ে গেছে। উঠে দেখে বাবা আর মামা বাজারে চলে গেছে। সে বারান্দায় বসে খবরের কাগজ দেখছে, এমন সময় পিছনে কখন মামা এসে দাঁড়িয়েছে সে বুঝতে পারেনি। কানে এল ছু উ উ উ, ছু মন্তর জন্তর ফন্তর, / হর বিসারী দূর করন্তর // সাত সমুন্দুর বারা বন্দর // চালিশ চুহা লে ছুছুন্দর // ছু উউউউউ'' কবিতা পাঠ করতে করতে বিজয় পলুর চারপাশে ঘুরতে লাগলো। হাঁ করে তাকিয়ে আছে মামার দিকে পলু। তুমি কি পাগল মামা মনে মনে সে ভাবল। অসাধারণ ছন্দে বলা এই আবোলতাবোল কবিতা পলুকে মুগ্ধ করল। মামার দিকে তাকিয়ে আছে অবাক হয়ে। কাছে আসছে না দেখে মামা আবার শুরু করল, ''কাম বয়, গুড বয়, ব্যাড বয়, ফ্যাট বয়,// হ্যাট বয়, কোট বয়, জিস বয়, দ্যাট বয়, // কলিং অল বয়, অল বয় কলিং / কলিং কলিং কলিং। আর দূরে থাকতে পারে না পলু। সে ছুটে এসে মামার কোমর জড়িয়ে ধরে। মামা তাকে কোলে তুলে নিলো। দুপুরে বাবা ফিরে গেল কলকাতায়। পলুর একটু মন খারাপ। চিলে কোঠার ঘরে বসে মামা আগের দিনের গল্পের উপর কিছু প্রশ্ন করল, সঠিক উত্তর পেয়ে মামা খুশি। বইয়ের আলমারি থেকে একটা পাতলা বই পলুকে দিয়ে বলল, ''এটা পড়।'' ''এমা এটাতো এখনি শেষ হয়ে যাবে'' পলু বলল। পাকামি না করে পড়। পিকুর ডায়েরি বইটার নাম। লেখক সত্যজিৎ রায়। চুপচাপ মামার দিকে সে তাকিয়ে রইল। মামার খুব পছন্দের লেখক।

''পিকুর ডায়েরি'' পড়ে খুব মজা পেল কারণ তার মনে হল এরকম বানান লিখলে তার মা মাথায় আলুর চাষ করবে। কিন্তু পিকুর খুব কষ্ট তার মা তাকে একা রেখে চলে যায়। এভাবে পলুর জীবনে আসেন সত্যজিৎ রায়। দুর্গা পুজোর সময় মামা তাকে গল্পের বই উপহার দেয়।

এখন পলু কলেজে ভর্তি হয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের সব বই মামা তাকে কিনে দিয়েছে। চাঁদের পাহাড় একটা পড়লে কি হবে, তার মনে অনেকগুলো চাঁদের পাহাড় দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল। আজ এই কিশোর বয়সেও সেই স্মৃতি হাজার হাজার চাঁদের পাহাড় হয়ে তার মনে বিরাজ করে। যেদিন সে ''খগম'' গল্পটা পড়ে স্থির থাকতে পারে নি। রাতে মামার সাথে ফোনে কথা বলে তবে শান্তি পায়। মাকেও বলেছিল কিন্তু মামাকে না বলে সে পারছিল না। এক এক করে ব্রাজিলের কালবাঘ, ছিন্নমস্তার অভিশাপ, তিন্তরেরার যীশু। খুব ভাল লেগেছিল ''ফটিক চাঁদ''। ফটিক চাঁদে হারুনের মুখের কথা মামা গড়গড় করে বলতো। হারুনের কাছে সব ছিল একটা আর্ট। সাধারণত কেউ কেউ বলে, ''চমকে দেব''। কিন্তু

হারুন বলত, ''ব্যোমকে যাবি, এমন আর্ট দেব না''। হারুন নিজেকে বলে ''কাম কম্যান্ডার ওয়ান্ডার ওয়ান্ডার / জাগলার জোকার জাম্পিং ওয়ান্ডার / ওয়ান্ডার খলিফ হারুন ওয়ান্ডার / ভেলকি ভেলকাম কাম কমাকম''। বলে লম্বা একটা টান দিক ''কাম....ম....ম....ম।''

''কানাইয়ের কথা'' গল্পটা পড়ে তার কানাই হতে ইচ্ছে হয়েছিল। জগাইবাবার সাহায্য নিয়ে কানাই তার বাবাকে চাঁদনী পাতার রস খাইয়ে সুস্থ করেছিল সুখনাই ব্যারামের হাতে থেকে, গোটা গ্রামকে সে রক্ষা করেছিল। কিশোর বয়সে পলু খুব স্বপ্ন দেখত যদি কারোর সুখনাই রোগ হয় সে জগাইবাবার কাছে গিয়ে ঠিকানা নিয়ে ওষুধ নিয়ে আসবে।

''অঙ্ক স্যার গোলাপি বাবু আর টিপু'' গল্পটা চিরকাল মনে থাকবে। দুঃখ দূর করলে কারোর তবে গোলাপি বাবুর নিজের দুঃখ দূর হবে। সে দুঃখ দেখতে পায়। ''তোমার মানে টিপুর কানের পিছনে নীল রঙ, হাতের লেখা খসখসে।'' কিছু জানতে হলে তাকে পাকস্থলীটা ঘাটতে হয়। তার মুখের ভিতরে একটাও দাঁত নেই, একটা জিভের ওপর আর একটা জিভ। একশৃঙ্গ অভিযান পড়তে পড়তে পলু যেন বারবার কোথায় হারিয়ে যাচ্ছিল। চার্লস উইলান্দের ডাইরিতে লেখা সেই লাইনটা তার এখনো মনে আছে, ''আই স এ হার্ড অফ ইউনিকর্ন টুডে। অল রাইট দিস ফুল পজেসান অফ মাই সেন্সেস।'' কাল্পনিক এই প্রাণীর কপাল থেকে বেরোনো একটা শিঙ। এখান থেকেই সে জানতে পারে মানস সরোবরে চারটি নদী মিশেছে – ব্রহ্মপুত্র, শতদ্রু, সিন্ধু ও করনালি।

বোম্বাইয়ের বোম্বেটে পড়ার পর ফেলুদাকে অন্য গ্রহের মানুষ মনে হয়েছিল। সমাদ্দারের চাবি গল্পে সংখ্যাতত্ত্ব অসাধারণ লেগেছিল। ''মঙ্গলই স্বর্গ'' মঙ্গলবাসীদের টেলিপ্যাথি ও সম্মোহনী শক্তি কর্তৃত্ব করছে পৃথিবীবাসীর উপর, তাদের ধ্বংস করতে হবে। পলু বুঝতে পেরেছে সত্যজিৎ রায় তার সৃষ্টিকে কোন শিশু, কিশোর, বড়দের পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। সব বয়েসের পাঠক পড়তে পারে। এমন বুদ্ধিদীপ্ত লেখা, সাথে ছবি, পাঠক শুরু করলে থামতে পারবে না। লেখকের লেখা এখানেই সার্থক। মামার সথে এক সঙ্গে বসে সে অনেক সিনেমা দেখেছে সত্যজিৎ রায়ের। বারবার হীরক রাজার দেশে, গুপিগাইন বাঘাবাইন, সোনারকেল্লা, অপুর সংসার, জয় বাবা ফেলুনাথ, আরও অনেক সিনেমা। এমন পরিচালনা, সঙ্গীত সৃষ্টি, সুরকার একজন মানুষ, সাথে ছবি আঁকা, এটা বোধ হয় ঐ ছয় ফুট লম্বা, পাজামা পাঞ্জাবি পরিহিত সত্যজিৎ রায়ের পক্ষেই সম্ভব।

সত্যজিৎ রায় যেখানে বেড়াতে গেছেন, ফেলুদাও সেখানে রহস্য সন্ধানে গেছেন। একটা ইংরাজি গল্প লিখে লেখার জগতে তার পদার্পণ। ''ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি'' দিয়ে ফেলুদার সিরিজের সৃষ্টি। পলুর বইয়ের তাকে থরে থরে সাজানো সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টি। এখন অনেক বাকি আছে পড়তে। ফেলুদা লেখার একটা বাড়তি আকর্ষণ দেশ ভ্রমণ। দার্জিলিং আর পুরী খুব প্রিয় জায়গা ছিল লেখকের। দার্জিলিং জমজমাট, হত্যাপুরী পড়লে মনে হবে সব চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে। ছোটবেলায় লখনউ বেড়াতে গিয়েছিলেন ''বাদশাহি আংটি'', বেনারস গিয়েছিলেন অপরাজিত সিনেমার জন্য। পরবর্তীকালে জয় বাবা ফেলুনাথ তৈরি হয়েছিল সেই বেনারসকে কেন্দ্র করে। তার সৃষ্টি ''সীমাবদ্ধ'' ছিল না। বাংলা সাহিত্যে তিনি অমর হয়ে থাকবেন চিরকাল।

দুর্লভ স্নেহ ■ দেবযানী মৈত্র

সুন্দরী আর মিনা পাশাপাশি ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। বারন্দায় বেরলেই দুজনের দেখা হয়। তবে মিনাকে দেখলেই সুন্দরীর যে কি হয় কে জানে? অমনি রাগে ফুঁসতে থাকে। মিনা ভয় পায়, তবে সে বাপু নিজেকে বাঁচিয়ে স্বাধীন ভাবেই ঘোরাফেরা করে। সুন্দরী কিন্তু একা একা রাস্তায় বের হয় না। যখনই সে বের হয় কেউ না কেউ থাকবেই। এই জন্য রাগ কিনা কে জানে। সেদিন যা ঘটেছিল বাবা! এখনও মনে পড়লে মিনার ভয়ে বুকটা থরথর করে কেঁপে ওঠে। যা বাঁচা বেঁচেছিল সেদিন। দাদাবাবু অফিস বেরিয়ে যাবার পর বৌদি দুটো ভাত মাছ খেতে দেয়। তাই খেয়ে জিভ দিয়ে চাটতে চাটতে দরজা দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে সবে বের হয়েছে, পড়বি তো পড় একেবারে সুন্দরীর মুখের সামনে। আসলে সুন্দরীও সেই সময় ওদের দরজা দিয়ে বের হচ্ছিল। একবারে মুখোমুখি। দেখেই তেড়ে এলো তার দিকে। ভাগ্যিস কাকুর হাতে চেনটা ধরা ছিল। তা নাহলে হয়তো মিনাকে কামড়ে ছিঁড়ে একেবারে শেষ করে দিত।

হ্যাঁ, এবার নিশ্চয় বুঝতে পারা গেছে যে সুন্দরী একটা পোষা কুকুর ও মিনা একটা পোষা বেড়াল। এটা তো গেল বেশ কিছুদিন আগের কথা। এখন তাদের মধ্যে আর সে রকম ব্যাপার নেই। কারণ দু'জনেরই যা অবস্থা হয়েছে। সুন্দরী চারটে বাচ্চা দিয়েছে, আর মিনা বাচ্চা পেড়েছে তিনটে। যে যার বাচ্চা নিয়ে ব্যস্ত। মিনার তো আবার একটা ভীষণ চিন্তা – কখন হুলো তার বাচ্চাদের সাবাড় করে দেয়।

এদিকে হয়েছে কি, সুন্দরীর চারটে বাচ্চাই বিক্রি হয়ে গেছে। ওদের নাকি 'ডগ শো'তে পাঠানো হবে। সুন্দরীও অনেক 'ডগ শো' করে অনেক কাপ জিতেছে ও অনেক টাকার চেকও পেয়েছে। কত ছবি আছে ওদের ড্রয়িং রুমে। তাই ওর বাচ্চারা অনেক টাকায় বিক্রি হয়ে গেছে। তাই বেচারী মনমরা হয়ে থাকে। এদিকে মিনার আবার তিনটে ছানার মধ্যে দুটো ছানাকে হুলোতে মেরে দিয়েছে। তাই সে-ও কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়ালো কিছুদিন। তারপর আবার ভুলে গিয়ে, যে একটা ছানা আছে তাকে গভীর স্নেহে চেটে চেটে আদর করতে থাকে। এই ভাবেই চলছিল। মিনা যেখানেই যাক, তাড়াতাড়ি করে চলে আসে বাচ্চাটার জন্য। একদিন হল কি, তাড়াতাড়ি রাস্তা পেরিয়ে আসতে গিয়ে একটা বাইক এমন জোরে আসলো যে মিনাকে একদম পিষে দিয়ে চলে গেল। আর তারপর ওই বাচ্চাটার কি কান্না। সারাক্ষণ ম্যা ম্যা করে সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে খুঁজে বেড়াতে লাগলো তার মা'কে।

পরদিন সকালে অবাক কাণ্ড। সকলের চোখে বিস্ময়, আনন্দ, আরো কত কি। কেউ কেউ আবার ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলতে লাগলো। কারণ এমন ছবি সত্যিই দুর্লভ। সেই সুন্দরী কুকুরের দুধ খাচ্ছে বিড়াল মিনার সেই ছানাটা। আর তাকে কি পরম স্নেহে চেটে চেটে আদর করছে ওই সুন্দরী কুকুর।

ওদের ড্রয়িং রুমে আরো একটা দুর্লভ ছবি স্থান পেল।

ফাঁকিবাজ ■ সৌরভ

আমাদের স্কুলের এক বন্ধু সব পড়াতেই ফাঁকি দেয়। ওর কাজই হলো ফাঁকি দেওয়া। অবশ্য আমিও একটু আধটু ফাঁকি দিই, তবে আমার থেকেও ও অনেক বেশি ফাঁকি দেয়। অর্থাৎ ও হলো মস্ত বড় ফাঁকিবাজ।

এবার আসল গল্পটা শুরু করি।

আমার নাম সুমন রায়, বয়স দশ। আমি ক্লাস ফাইভে পড়ি। ওর নাম সুশান্ত মুখার্জি। ও আমার ক্লাসেই পড়ে। ওর ডাক নাম শান্তু। অনেক সময় নামের মতো ছেলে হয়না। ও মোটেও শান্ত নয়। ও যেমন ফাঁকিবাজ তেমন মহা দস্যি ছেলে। ও গঙ্গায় জোয়ারের সময় সাঁতার কাটে। বাড়ি থেকে পালিয়ে খেলাধুলো করে। কোচিং ক্লাসে মাস্টার মশায়ের চোখে ধুলো দিয়ে পালায়। এটা ও পড়তে না গিয়ে করে।

তা সেবার হলো কি ও মাস্টার মশায়ের কাছে সেদিন পড়তে যায়নি। ওদিকে মাস্টার মশাই ভাবছেন ব্যাপার কি, শান্তু পড়তে এলো না কেন? তাহলে কি ওর শরীর খারাপ হলো? না না, সে হওয়ার কথা নয়, এইতো সকালে ওকে দোকানে দেখলাম। আমি ওকে এও জিজ্ঞাসা করলাম, কিরে শান্তু, জ্যামিতি পড়া মুখস্ত হয়েছে তো? শান্তু বলল – হ্যাঁ স্যার, আমি মুখস্ত করছি, আজকের মধ্যেই হয়ে যাবে। আমি বললাম – সে হলেই ভাল, না হলে তোর ভাগ্যে নাচছে মার। শান্তু বলল – না স্যার আমি ভাল করেই মুখস্ত করব, এমন ভাবে মুখস্ত করব যে আপনি আমাকে মারতে পারবেন না।

এসব আগের কথা। স্যার চিন্তা করতে করতে ভাবলেন, আরে এটা তো আগে চিন্তা করিনি, নির্ঘাৎ মুখস্ত হয়নি ওর, তাই হয়ত আসেনি ব্যাটা! তাহলে ওকে কি আমি ওর বাড়িতে পাব? না না, ও বাড়িতে থাকলে এতক্ষণে কোচিং-এ এসে বসে থাকত। ওকে আমি হয়ত মাঠে পাব। নির্ঘাৎ ব্যাটা ফুটবল নিয়ে কেরামতি করে খেলছে।



এসব ভেবে স্যার কোচিং সেন্টারে যারা পড়তে এসেছিল তাদের বললেন – এই তোরা কেউ

চেঁচামেচি করিস না যেন, আমি একটু আসছি। এই বলে তিনি মাঠের দিকে যাবার জন্য পা চালালেন।

এমনিতে বর্ষাকাল, আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। মাঠটা গঙ্গার ধারে। একটু এগোতেই গঙ্গার ফুরফুরে বাতাস শরীরে লাগতে শুরু করল। মাঠের কাছে পৌঁছে তিনি দেখলেন রাস্তায় এখনো আলো জ্বলেনি। সাড়ে ছটা বাজে। মাঠে এসে তিনি দেখলেন বেঁটে একটা ছেলে মাঠে একা একা ফুটবল নিয়ে খেলছে। তিনি বুঝলেন ওটাই শান্তু। মনে মনে বললেন, দাঁড়াও বাবা শান্তু, দেখাচ্ছি তোমার মজা! তোমার খেলার বারোটা বাজাচ্ছি! পড়াশোনা ফেলে এখন তুমি খেলছ!

তৎক্ষণাৎ শান্তুর মনে হল কেউ যেন মাঠে ঢুকছে। সে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল মাস্টার মশাই। ও তখন ভাবল মাস্টার মশায়ের খপ্পরে পড়লে আর রক্ষা নেই, আমার ভাগ্যে জুটবে ঘুসি আর থাপ্পড়। ও ভাবল পালানোর চেষ্টা করি। তারপর ভাবল মাঠের ওই দিকটা কাদায় ভর্তি, ওখানেই মাস্টার মশাইকে ফ্ল্যাট করব। তারপর কাদার দিকে দৌড় লাগাল। ও অবশ্য কাদার ওপর দিয়ে গেল না, ও কাদার পাশ দিয়ে গেল। যদি শান্তু কাদার ওপর দিয়ে যেত তাহলে মাস্টার মশায়ের জায়গায় ও-ই ফ্ল্যাট হত।

ও ওদিকে ছুটছে দেখে মাস্টার মশাইও দৌড় লাগালেন। তারপর মাস্টার মশায় হঠাৎ শূন্যে ভেসে গেলেন, তারপর সোজা কাদার মধ্যে ফ্ল্যাট!

মাস্টার মশায় চেঁচিয়ে বললেন – পালাচ্ছিস পালা, কিন্তু কাল তোকে আলুভাতে বানাব শান্তু!

এভাবে শান্তু মাস্টার মশায়ের চোখে ধুলো দিয়ে পালাল।



প্র ব ন্ধ

হাস্য থেরিয়াম ■ রথীন কর

'গোমড়া থেরিয়াম', 'ল্যাংড়া থেরিয়াম', চিল্লানোসরাস' – এসব শব্দের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় আছে কি? বোধহয় সকলের নেই। তাহলে বুঝিয়ে বলি – যে সব সময় বিরক্ত মুখে বসে থাকে, খাওয়া দাওয়া, হাসিঠাট্টা কিছুই ভাল লাগে না – সে হল গোমড়া থেরিয়াম, যে চিল্লিয়ে পাড়া মাত করে সে হল চিল্লানোসরাস, কেউ কেউ আবার এমন গালগল্প করে, গল্পের কোনো মাথামুণ্ডু নেই, সে হল 'গল্প থেরিয়াম'। এখন তোমরা প্রশ্ন করতে পারো – এসব কথা জানলে কী করে? হুঁ, হুঁ, এসব কথা লেখা আছে শিকারি প্রফেসর হেশোরাম হুঁশিয়ার এর দিনলিপিতে ছবি সহ। শিকার করতে গিয়ে যেসব পাখি, জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল হেশোরামের, তাদের আচার আচরণ, ভাবভঙ্গি দেখে এইসব নামকরণ করেছে সে। আমাদের চারপাশেও এরকম লোক দেখতে পাওয়া যাবে। এই সব অদ্ভুত গল্পের লেখক হলেন – না, এখন বলবো না নামটা। 'হাঁসজারু', 'বকচ্ছপ', 'হাতিমির' উদ্ভট উদ্ভট প্রাণীর কথা লেখা আছে তাঁর 'আবোল তাবোল' বইতে। এদের সঙ্গে তোমাদের বিলক্ষণ পরিচয় আছে। হেড আপিসের বড়বাবু যার গোঁফজোড়া চুরি গিয়েছিল, ভীস্মলোচন শর্মা যার গান শুনে সবাই ভিরমি খেতো, পাগলা জগাই যে একাই লড়াইতে সাত জার্মান খতম করে। চণ্ডীদাসের খুড়ো যার সামনে খাবার ঝোলে একটা কল থেকে অথচ সে তার নাগাল পায় না – এদের সাথে তো তোমাদের পরিচয় আছে। এবার এসো পরিচয় করিয়ে দিই, এই সবকিছুর লেখক হলেন অদ্বিতীয় সুকুমার রায়।

স্বখ্যাত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর দ্বিতীয় সন্তান। মায়ের নাম বিধুমুখী। উপেন্দ্রকিশোর ভালো বাঁশি ও বেহালা বাজাতেন, ছবি আঁকতেন। তোমাদের জন্য মজার মজার গল্প লিখে গেছেন। তাঁর বাড়িতে সারাদিন হৈ চৈ, হাসি-গল্প লেগেই থাকতো। এই রকম পরিবেশে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর বাংলা ১২৯৪ সালের ১৩ কার্তিক সুকুমার রায়ের জন্ম হয়। ছোটবেলা থেকেই তিনি চঞ্চল ও হাসিখুশী প্রকৃতির ছিলেন। নতুন খেলনা পেলে ঠুকে ঠুকে ভেঙে ভেতরকার রহস্যের কিনারা করতে চাইতেন। মজার মজার গল্প বলতে পারতেন। নানা রকম জীবজন্তুর ছবি দেখিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত মনগড়া গল্প বলে হাসাতেন। এইসব আজগুবি জীবজন্তুর কিছু কিছু ছবি 'আবোল তাবোল', 'হ য ব র ল' প্রভৃতি বইয়ের পাতায় পাতায় পাবে। আর মজার মজার কবিতা বিচিত্র মুখভঙ্গি সহকারে অভিনয় করে দেখাতেন। ছড়াকাটার খেলা, রাগ বানানো খেলা, এসব খেলা উদ্ভাবন করে খুব মজা করতেন। দু-একটা নমুনা পেশ করি। মাস্টারমশাই উপদেশ দিয়েছিলেন নিজের জিনিস গুছিয়ে রাখতে। মাস্টারমশাইয়ের কথা তো মানতেই হবে। তা ছোট বোন টুনি পা ছড়িয়ে বসেছিল। সুকুমার তাকে গুছিয়ে ডেস্কে রেখে দিলো। একবার মাঘোৎসবের সময় ছোটদের জন্য এক ড্রামভর্তি রসগোল্লা নিয়ে আসা হল। পরিবারের বন্ধু পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মজা করে জিজ্ঞেস করলেন, ''এত রসগোল্লা কে একা একা খেতে পারবে?'' কেউ হাত তোলে না। সুকুমার জোর দিয়ে বলে উঠলো, 'আমি পারি।' সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রীমশাইকে ফিসফিস করে

বললেন, ‘অনেক দিনে।’

একটু বড় হয়ে সুকুমার নাটক লিখতে শুরু করলেন, ‘ঝালাপালা’, ‘লক্ষণের শক্তিশেল’, ‘চলচিত্রমঞ্জরী’, ‘অবাক জলপান’, প্রভৃতি। অবাক জলপানে তোমরা কেউ কেউ হয়তো অভিনয় করেছ, গ্রীষ্মের দুপুরে সেই তৃষ্ণার্ত পথিকের আকুল আবেদন মনে পড়ে – ‘একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?’ ভাই বন্ধুদের নিয়ে দল গড়লেন, নাম দিলেন ‘ননসেন্স ক্লাব’। ‘সাড়ে বত্রিশ ভাজা’ নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা বের করলেন। তিনি নিজে নাটকে সবচেয়ে বোকা আনাড়ি হাঁদারামের চরিত্রে অভিনয় করতেন। দর্শকরা সে অভিনয় দেখে হেসে কুটিপাটি।

পদার্থবিদ্যা আর রসায়নশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বিএসসি পাশ করেন সুকুমার। এরপর আলোকচিত্র ও মুদ্রণের ব্যাপারে শিক্ষালাভের জন্য বিলেত যাত্রা করেন ১৯১১ সালে। বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষা শেষ করে ১৯১৩ সালের শেষে দেশে ফিরে আসেন। ১৯১৫ সালে মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে বাবা উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু হয়। ফলে আটাশ বছরে ভাই সুবিনয়ের সঙ্গে পারিবারিক কারবার ও বৃহৎ পরিবারের সমস্ত দায়দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন।

ননসেন্স ক্লাবের পরে সুকুমার ঘনিষ্ঠজনদের নিয়ে ‘মনডে ক্লাব’ বা ‘মণ্ডা ক্লাব’ স্থাপন করেন। বিচিত্র রসে ভরপুর ছিল এই ক্লাবের কাণ্ড-কারখানা। একটি নেমন্তন্ন পত্রের নমুনা দিলে বুঝতে পারবে ব্যাপারটা কেমন মজার –

সতেরোই শনিবার অপরাহ্ণ বেলা
গড়পাড়ে হৈ হৈ সরস্বতী মেলা,
সরবৎ, সদালাপ, সংগীত ভীতি,
ফাঁকি দিলে নাহি লাভ
জেনে রেখো ইতি।

আবার গল্পকথায় ফিরে আসি। দেশ বিদেশের বিখ্যাত রূপকথার গল্প পুরাণের গল্প। মজাদার উদ্ভট গল্প সহজ সরস ভাষায় সন্দেশ পত্রিকার পাতায় ছোটদের জন্য সাজিয়ে দিতেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ওপরও অনেক গল্প লিখে গেছেন তিনি। আর হাসির গল্প যে কত আছে – এক ‘পাগলা দাশু’কে নিয়েই কত কাণ্ড। কালাচাঁদের ছবি, ভোলানাথের সর্দারি, জগ্যিদাসের মামা, এরকম অনেক গল্প আছে যেগুলি পড়লে গোমড়া থেরিয়ামও হাস্য থেরিয়াম হয়ে যাবে।

একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিই এইবেলা –

হলদে সবুজ ওরাং ওটাং,
ইট পাটকেল চিৎপটাং,
মুস্কিল আসান উড়ে মালি
ধর্মতলা কর্মখালি।

দু'দিন উপোস করে তিন দিনের দিন সকালবেলা কোনো দাঁড়কাককে সামনে পেলে এই মন্ত্রটা পড়ে ফেলবে – ‘হ্রিঘাংচু’র দেখা পেতেও পার। হ্রিঘাংচু কে? আমি কি জানি! সুকুমার রায়কে জিজ্ঞেস কর। নিদেনপক্ষে গল্পটা পড়ে ফ্যালো।

ডানপিটে ছেলেরা কেমন হয় জানো? শোন সুকুমার রায় কী বলেছেন –

শিলনোড়া খেতে চায় দুধভাত ফেলে!
একটার দাঁত নেই, জিভ দিয়ে ঘষে,
একমনে মোমবাতি দেশলাই চোষে!
আরজন ঘরময় নীল কালি গুলে,
কপ্‌কপ্ মাছি ধরে মুখে দেয় তুলে!

রামগরুড়ের ছানাদের তো চেনো। তারা ‘‘হাসির কথা শুনলে বলে / হাসব না-না, না-না’’। তোমরা কিন্তু এরকম হোয়ো না।

নাটক নিয়ে একটা মজার ঘটনা বলি – কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে সুকুমার শান্তিনিকেতনে যেতেন। একবার ১৯১২ সালে তিনি ‘অদ্ভুত রামায়ণ’ থেকে ‘ঐ আসে, ঐ আসে’ – গানটি গেয়েছিলেন। সকলেরই এটি এত ভালো লেগেছিল যে তাঁকে দেখেই সবাই বলতো, ‘ঐ আসে।’

দ্যাখো কাণ্ড। বলছিলাম গল্পের কথা। কোত্থেকে নাটক ঢুকে পড়লো। ফিরে আসি গল্পে। ‘হ য ব র ল’ পড়েছ নিশ্চয়ই। সেই ফ্যাঁচ ফেঁচে বেড়ালের ধাঁধার কথাটা মনে আছে তো? চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ রুমালের মা – হল চশমা। এই সর্বজ্ঞানী বেড়ালের কথা শুনে একেবারে সোজা রাস্তায় তিব্বত চলে যেতে পার – কলকাতা, ডায়মণ্ড হারবার, রাণাঘাট, তিব্বত, ব্যাস সিধে রাস্তা, সওয়া ঘণ্টার পথ। তবে গেছো দাদার পাল্লায় পড়েছ কি গেছ, সে কখন কোথায় থাকে সে হিসেব করতে গেলে সব অঙ্ক বেবাক ভুল হয়ে যাবে। হাতে থাকবে শুধু পেন্সিল। আর শ্রী কাকেশ্বর কুচকুচের কাছে কখনো অঙ্ক শিখতে যেয়ো না, তার চেয়ে বরং বোম্বেগড়ের রাজার পিসির সঙ্গে কুমড়ো দিয়ে ক্রিকেট খেলা ভালো। দুই ভাই উধো আর বুধোর কাণ্ড, ব্যাকরণ সি, বি এ নামে কে ছাগলের কথা, শিয়ালের বিচারসভা - সে সব একেবারে হৈ হৈ ব্যাপার। এর মধ্যে আবার আছে নেড়ার বেসুরো গলার গান –

বাদুড় বলে, ওরে ভাই সজারু,
আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু।

১৯২১ সালে তাঁর একমাত্র সন্তান মানিকের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে তিনিই বিখ্যাত সত্যজিৎ রায়। চিত্র পরিচালক, চিত্রশিল্পী, ফেলুদা কাহিনী, প্রফেসর শঙ্কু ও অনেক ছোটদের গল্পের লেখক। এই বছরেই তাঁর জন্মশতবার্ষিকী। তোমরা তাঁর লেখা পড়ো, মজা পাবে।

ওই বছরেই সুকুমার তৎকালীন মারণরোগ কালাজ্বরে আক্রান্ত হন। বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে স্বাস্থ্য উদ্ধারে। প্রায় আড়াই বছর রোগ-ভোগের সময়ও সন্দেশ পত্রিকা প্রকাশের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। ১৯২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর এই সদাহাস্যময় মজার লেখক ও কবি আমাদের ছেড়ে চলে যান। রেখে গেছেন সাহিত্যের মণিমুক্তো।

আদিম কালের চাঁদিম হিম,
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর
গানের পালা সাঙ্গ মোর।

জয় বাবা সত্যজিৎ ■ ডালিয়া মুখার্জী

ছেলেটি ছিল বড়ই ভীতু। স্কুলে কোনো বিষয়ে পুরস্কার পাচ্ছে শুনলেই ভয়ে তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসত। এই এত লোকের সামনে ওর নাম ডাকা হবে। জায়গা ছেড়ে উঠে হোমরাচোমরা কারও হাত থেকে সে পুরস্কারটা নেবে। তারপর হেঁটে এসে নিজের জায়গাতে ফিরে এস বসবে। এই পুরো ব্যাপারটাই ছিল ওর কাছে ভয়াবহ আতঙ্কের। কিন্তু আফসোস! সারা জীবনভর তাকে অজস্রবার এই আতঙ্গের মধ্য দিয়ে যেতে হলো। নিতে হল অগুনতি পুরস্কার। নিজের দেশে তো অসংখ্য পুরস্কার এলই ওর হাতে। বিদেশের তাবৎ সব লোকজনও তাকে রেহাই দিল না ঘন ঘন পুরস্কার নেওয়ার আতঙ্ক থেকে।

বেচারা এই ছেলেটার ডাকনাম মানিক। ভালো নাম সত্যজিৎ রায়। কেউ তাঁকে বলে বড় চলচ্চিত্র পরিচালক। কেউ বলে ছোটদের লেখক। অনেকেই তাঁকে চেনে ফেলুদা বা প্রফেসর শঙ্কুর জনক বলে। গানে দিতেন মনমাতানো সুর। ছবি আঁকার হাতও ছিল অপূর্ব। এ যেন অনেকগুলো মানুষের প্রতিভা, অথচ মানুষ তো ওই একজনই – সত্যজিৎ রায়।

সারা পৃথিবীর বড় বড় মানুষেরা তাঁকে সিনেমার বিরাট পরিচালক বলে জানলেও তিনি কিন্তু ছোটদের অত্যন্ত প্রিয় একজন মানুষ। তাঁর যত লেখালেখি, তার বড় অংশটিই শিশু-কিশোরদের জন্য।

সত্যজিৎ রায় এক বাঙালি কিংবদন্তী, যিনি বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকারের খ্যাতি অর্জন করেছিলেন বিশ্বদরবারে। কর্মজীবনে একই সাথে চিত্রনাট্য রচনা, সঙ্গীত স্বরলিপি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশক, চিত্রকর, গ্রাফিক নকশাবিদ, লেখক ও চলচ্চিত্র সমালোচক হিসেবে ভূমিকা রেখেছেন অসম্ভব গুণী এই মানুষটি। ১৯২১ সালে কলকাতার শিল্প-সাহিত্যচর্চায় খ্যাতনামা এক বাঙালি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার মসূয়া গ্রামে রয়েছে তাঁর পৈত্রিক ভিটা। ইতালীর নব্য বাস্তববাদী ছবি 'লাদ্রি দি বিচিক্লেত্তে' বা 'দ্য বাইসাইকেল থিফ' তাঁকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন চলচ্চিত্র নির্মাণের। প্রথম চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালী'র জন্যই পেয়েছিলেন ১১টি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, যার মধ্যে অন্যতম হল কান চলচ্চিত্র উৎসবে পাওয়া 'শ্রেষ্ঠ মানব দলিল' পুরস্কার।

ফেলুদা, জটায়ু, তোপসে, মুকুল কিংবা গুপি গাইন বাঘা বাইন, বা হীরক রাজার দেশে'র মাস্টারমশাই, সত্যজিৎ-এর ছবির এই সমস্ত চরিত্র আজও ছোট-বড় সব বাঙালির খুব কাছের। শিশু-সাহিত্যই হোক কিংবা শিশু-চলচ্চিত্র, শিশুদের মন বুঝে

তাদের মনগ্রাহী গল্প উপহার দেওয়া নেহাত সহজ কাজ নয়। চলচ্চিত্র পরিচালক হিসাবে সেই কাজ সাফল্যের সঙ্গে করেছেন সত্যজিৎ। তাঁর সেই সমস্ত সৃষ্টি দিয়ে আজও তিনি রয়েছেন বাঙালির মননে।

সত্যজিৎ-এর শিশু কেন্দ্রিক চলচ্চিত্রের গল্পে জীবনের বিভিন্ন বয়সে বাঙালি খুঁজে পেয়েছে কাহিনীর নতুন নতুন 'মানে'। তা সে 'হীরক রাজার দেশে'-ই হোক বা 'পরশ পাথর'-এ হোক। শিশুর সারল্য নিয়ে দেখা যে ছবির গল্প অনেকটা সহজ মনে হয়েছে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ছবিই ছুঁয়ে গিয়েছে বাঙালির সমাজবোধ কিংবা রাজনৈতিক বোধকে। আর সে জন্যই এই সমস্ত ছবি কালজয়ী। এই সমস্ত ছবি বাঙালরি গর্বের 'পাওনা'। একবার ফের মনে করে নেওয়া যাক, সত্যজিৎ নির্মিত শিশু কেন্দ্রিক বেশ কয়েকটি ছবিতে।

সোনার কেল্লা

রাজস্থানের প্রেক্ষাপটে নির্মিত 'সোনার কেল্লা' মুক্তি পায় ১৯৭৪ সালে। ছবির কাহিনী, এক জাতিস্মর শিশুর অপহরণকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। ছবিটি 'ফেলুদা' সিরিজের অন্যতম বিখ্যাত ছবি। ছবিতে সেই শিশুকে উদ্ধার করতেই আগমন গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্র ওরফে 'ফেলুদা'র। ফেলুদার সঙ্গে রয়েছেন তাঁর সহকারী তথা ভাই 'তোপসে', আর রয়েছেন লেখক জটায়ু। ছবির প্রতিটি চরিত্র এমনকি সংলাপ আজও জনপ্রিয়।

জয়বাবা ফেলুনাথ

জানা যায়, আর্থার কোনান ডয়েলের সৃষ্টি করা বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্র শার্লক হোমস থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সত্যজিৎ বানিয়েছিলেন গোয়েন্দা চরিত্র 'ফেলুদা'। বাঙালি এই গোয়েন্দার নানা কাহিনীর লেখক সত্যজিৎ রায়। তবে ফেলুদা সিরিজের মাত্র ২টি ছবিতেই তিনি পরিচালনার কাজ করেন। 'সোনার কেল্লা'র পর 'জয় বাবা ফেলুনাথ' ছবির পরিচালনা করেন তিনি। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৭৯-এ। এই ছবির প্রেক্ষাপট বারাণসী। সেখানে এক মূর্তিকে ঘিরে যাবতীয় রহস্য উদঘাটন করে ফেলুদা। তাঁর চরিত্র মগনলাল মেঘরাজ আজও বাংলা ছবিতে অন্যতম ভিলেন।

পরশ পাথর

ছোটদের জন্য তৈরি করা সত্যজিৎ রায়ের অপর মনকাড়া ছবি 'পরশ পাথর' মুক্তি পায় ১৯৫৮ সালে। এই ছবির মধ্যে নীতি শিক্ষা যতটা রয়েছে ততটাই ঠাসা রয়েছে গভীর সমাজবোধ। সাদাকালো ফ্রেমে, স্বর্ণযুগের অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তীর কালজয়ী অভিনয় আজও বাঙালির অন্যতম সেরা পাওনা।

হীরক রাজার দেশে

১৯৮০ সালে মুক্তি পায় পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে'। ছবিতে ছন্দ মিলিয়ে মজার সংলাপের আড়ালে এক সুচতুর বার্তা দিয়েছেন পরিচালক সত্যজিৎ। এটি 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' সিরিজের অন্যতম ছবি। গোটা ছবি জুড়ে এক নিপুণ সমাজভাবনা উপহার দিয়েছেন এই অস্কারজয়ী পরিচালক।

গুপী গাইন বাঘা বাইন

সাহিত্যিক তথা সত্যজিৎ রায়ের দাদু উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী সৃষ্টি করেছিলেন দুটি কালজয়ী চরিত্র, গুপী গাইন ও বাঘা বাইন। সেই দুই চরিত্রকে নিয়েই ১৯৬৯ সালের ছবি 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'। গ্রাম বাংলার প্রেক্ষাপটে সাজানো এই ছবি জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতকে পেরিয়ে যুদ্ধে জেতার গল্প তুলে ধরা হয়েছে। গোটা ছবিটি সাদা-কালো হলেও শেষে এক বিশেষ মুহূর্তে ছবিটিতে 'রঙ' দিয়ে তাকে 'কালার ফিল্মে' রূপান্তরিত করা হয়েছে। যা পরিচালকের মুন্সিয়ানা নিয়ে প্রশংসার দাবি রাখে।



স্মরণে সত্যজিৎ রায় ■ ধ্রুব বসু

উচ্চতা তাঁর শুধু শরীরে বা প্রতিভাতেই নয়, উচ্চতা ছিল তাঁর হৃদয়েও। হ্যাঁ, আমি সেই বিশ্বোদ্ভাসিত শিল্পপ্রতিভা সত্যজিৎ রায়ের কথাই বলছি।

সত্যজিৎ রায়কে আমি প্রথম সামনাসামনি দেখি শিলিগুড়িতে। ১৯৭৯ কি ১৯৮০ সালে। কোন একটা ছবির শ্যুটিং করতে গিয়েছিলেন। শ্যুটিং-এর পরে স্থানীয় একটি হোটেলে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সম্বর্ধনা দেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। যে হলঘরে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়, সেই ঘরে ওঁনার বসার প্ল্যাটফর্মটা ছিল একটু বেশি উঁচু। অভ্যর্থনাকারী ব্যক্তিরা তাই প্ল্যাটফর্মের পিছন দিয়ে উঠে উঠে পিছন দিক থেকেই ওঁনাকে মাল্যদান করছিল। ব্যাপারটা সত্যজিৎবাবুর কাছে খুব হাসির লাগছিল এবং আমাদেরও এবং উনি সমানে হাসছিলেন। পরদিন, উনি আমাদের একান্ত অনুরোধে শিলিগুড়ি আকাশবাণীকে একটা ইন্টারভিউ দেন। বলেছিলেন, পাঁচ মিনিট সময় দেবো, কিন্তু এক ঘণ্টার মতো সময় দিয়েছিলেন। ইন্টারভিউ নিয়েছিল আমার বন্ধু আকাশবাণীর আধিকারিক অসীম রেজ। অসীম পরে আমাকে বলল, উনি বাইরে থেকে এত গম্ভীর, অথচ আসলে যে এত দিলখোলা, ভাবাই যায় না। ইন্টারভিউ হয়ে গেলে, অন্য এক পরিচালকের কাজ নিয়েও ওঁনার মত ব্যক্ত করেছিলেন। সেটা আর এখানে নাই বা বললাম। তাঁর তুলনায় বয়সে অনেক ছোট এক অভিনেতার একটা লেখায় পড়েছিলাম, শ্যুটিং-এর সময় তার ভয়ভাব কাটাবার জন্য সত্যজিৎ রায় তাকে সিগারেট অফার করেন। সেই অভিনেতা ওঁনার সামনে অভিনয় করতে খুব নার্ভাস বোধ করছিল। পথের পাঁচালি ছবির এই নির্মাতা ঋত্বিক ঘটক সম্বন্ধে এক সময় বলেছিলেন, ঋত্বিক আমার থেকে বেশি ভারতীয়। টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে কাজ করার সময়ে শুনেছিলাম, উনি শ্যুটিং ফেরতা মাঝ রাস্তা থেকে ঋত্বিক ঘটককে তুলে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিতেন।

ওই স্টুডিওতে কাজ করতাম যখন, একটি ছেলে আমার কাছে মাঝে মাঝে আসত চাকরি চাইতে। ও স্টুডিওর কাজকর্ম অল্প অল্প জানত। কিন্তু ছেলেটি একটু ছিটগ্রস্ত ছিল। একদিন ও সোজা চলে যায় সত্যজিৎবাবুর বাড়ি। সত্যজিৎবাবু মন দিয়ে তার কথা শোনেন। তারপর বলেন এভাবে তো হয় না। স্টুডিওতে যাও, প্রযোজক-পরিচালকদের ঘরে ঘোরাঘুরি করো, তাদের ধরাধরি করো। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে হয়তো একদিন কাজ পাবে।

চুঁচুড়ার একটি ছেলে একবার কতকগুলো কবিতা লিখে সন্দেশ পত্রিকায় পাঠিয়েছিল। লেখা ছাপা হচ্ছেনা দেখে সত্যজিৎবাবুকে ফোন করে বসে। উনি বলেন, সন্দেশে সম্পাদক হিসেবে আমার নাম থাকলেও আমি ওটা দেখি না। যাই হোক, তুমি যখন বলছ আমি দেখে রাখব। তুমি আমায় দশ দিন বাদে ফোন কোরো। ছেলেটা দশ দিন বাদে আবার ফোন করে। সত্যজিৎবাবু বলেন, তুমি তো সুকুমার রায়কে নকল করে কবিতা লিখেছ। ওই ভাবে তো বড় কবি হওয়া যায় না। যাই হোক, তোমার একটা কবিতা আমি

ছাপতে বলে দিয়েছি। কিন্তু তুমি নিজস্ব রীতিতে লেখার অভ্যাস কর।

আমাদের তথ্য বিভাগের একজন আধিকারিক অপেক্ষাকৃত কম বয়সে জয়পুরে পোস্টেড ছিল। জয়পুর থেকে সে সত্যজিৎবাবুকে চিঠি লিখত। আর চিঠিতে ওঁনার লেখায় কোথায় কি কি ভুল আছে সেগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করতো। বেশ কয়েক বছর পর তার নন্দনে পোস্টিং হয়। এই রকম এক সময়ে একদিন সত্যজিৎ রায় এলেন। ছেলেটি এসে ঢপ করে ওঁনাকে প্রণাম করতে, উনি ওর পরিচয় জানতে চাইলেন। ছেলেটি পরিচয় দিতে সত্যজিৎ রায় তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। ওর প্রশংসা করলেন।

বাংলা ছবির একটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক অপূর্ণ দিক হল ওঁনার ছবিতে সুচিত্রা সেন আর ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় না করা। সুচিত্রা সেনকে নিয়ে সত্যজিৎবাবু দেবী চৌধুরানী করতে চেয়েছিলেন। সব ঠিকও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডেট নিয়ে মতদ্বৈধ হওয়ায়, ছবিটা আর হয় নি। অন্তত আমি যা শুনেছি।

আর ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাপার। তুলসী চক্রবর্তী মারা যাবার পর ওঁনার স্মরণে টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে একটা সভা হয়েছিল। সেখানে সত্যজিৎবাবু বলেন, বাংলা চলচ্চিত্রে এত বড় কমেডিয়ান আর আসে নি। শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় – এক প্রত্যক্ষদর্শী পরিচালকের মুখে শুনেছি। ‘‘আমারে কাজ দিয়া দ্যাখছে?’’ – ভানুবাবু নাকি বলেছিলেন।

জীবনে কোনোদিন আপস করেন নি। অন্য শিল্পীদের মতো ইচ্ছে করলেই বোম্বাই, এমন কি বিদেশে গিয়েও থাকতে পারতেন। কিন্তু থাকেন নি, এমনি ছিল বাংলার প্রতি তাঁর টান। ভারত সরকার তাঁকে অনুরোধ করেছিল জহরলাল নেহেরুর ওপর একটা ছবি বানাতে। I am not a good propagandist – সপাটে জবাব দিয়েছিলেন তিনি। পথের পাঁচালি করতে সত্যজিৎ রায়ের কালঘাম ছুটে গিয়েছিল। সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু সে সাহায্য আটকে গিয়েছিল। কারণ সেই সময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রচার অধিকর্তা এস মাথুর নোট দিয়েছিলেন যে এই ছবিকে টাকা দেওয়া যাবে না, কারণ এই ছবিতে উন্নয়ণের কোন চিত্র নেই। পরে বিধান রায়ের নির্দেশে পথের পাঁচালির জন্য সরকার অর্থ বরাদ্দ করে।

সত্যজিৎ রায়ের সব ছবিই আমি একাধিকবার দেখেছি। কিন্তু যে ছবিটা আমি বার বার দেখি, সেই ছবিটা হল ‘আগন্তুক’। দেখি আর হাউ হাউ করে কাঁদি। কারণ ছবিটা আমার হৃদয়কে নিংড়ে শেষ করে দেয়।

Krishanu Quarterly
Vol LIV/1
Rs. 35.00
Regd No.
R. N. 16533/68

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রচিত সহজ পাঠ গানে গানে

সহজ পাঠ
সহজ গান

সহজ পাঠ-এর আঠেরোটি কবিতা
সুরে সুরে গানে গানে ...

সুর ও পরিচালনা — মদন দাস

কণ্ঠে — বউল দাস

সহশিল্পীবৃন্দ :
দেবারতি ভট্টাচার্য, পূজা বন্দ্যোপাধ্যায়,
সায়নীতা রায়, স্বাগতা মুখোপাধ্যায়,
মৌসুমি নাথ ও শিপ্রা দে।

শোনার জন্য এই লিঙ্কে ক্লিক করুন
www.archive.org/details/SahajPath

মদন দাস কর্তৃক ৩০/১৫, কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত ও
সোনার্টার সল্যুশনস, ৬২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।